লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

প্রকাশনার ৯৪ বছর

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে
Love for All
Hatred for None

পাক্ষিক আহ্‌মদী

The Ahmadi Fortnightly
Since 1922

নব পর্যায় ৭৯ বর্ষ | ৩য় সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ৩১ শ্রাবণ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ | ১১ জ্বিলক্বদ, ১৪৩৭ হিজরি | ১৫ জহুর, ১৩৯৫ হি. শা. | ১৫ আগষ্ট, ২০১৬ ঈসাব্দ

যুক্তরাজ্যের ৫০তম জলসা সালানা সফল হোক

AHMADIYYA MUSLIM ASSOCIATION
50th
JALSA SALANA 2016
UNITED KINGDOM

জলসার অনুষ্ঠান সূচী
১৮ পৃষ্ঠায়

‘তোমরা যা ভালোবাস তা থেকে (আল্লাহ্‌র পথে) খরচ না করা পর্যন্ত তোমরা কখনও প্রকৃত পুণ্য অর্জন করতে পারবে না। আর তোমরা যা-ই খরচ কর আল্লাহ্ নিশ্চয় সে বিষয়ে পুরোপুরি অবগত।’

(সূরা ঃ আলে ইমরান : ৯৩)

হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন- “যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করে, নিশ্চয় সে আল্লাহ্ তাআলার আনুগত্য করে। যে ব্যক্তি আমার অবাধ্যতা করে, নিশ্চয় সে আল্লাহ্ তাআলার অবাধ্যতা করে। যে ব্যক্তি আমার আমীরের আনুগত্য করে, নিশ্চয় সে আমার আনুগত্য করে। যে ব্যক্তি আমার আমীরের অবাধ্যতা করে, নিশ্চয় সে আমার অবাধ্যতা করে।”

(বুখারী, মুসলিম ও মেশকাত)।

“যে ব্যক্তি কুরআন শরীফের শত শত আদেশের মধ্যে একটি ছোট আদেশকেও লংঘন করে, সে নিজ হস্তে নিজের মুক্তির দ্বার রুদ্ধ করে।”

–হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত-এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা **হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)** রচিত **‘আল্ ইস্তিফতা’** পুস্তিকাটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে, আলহাদুলিল্লাহ।

ভাষান্তর করেছেন **মাওলানা ফিরোজ আলম**।

বইটি আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে।

আপনার কপিটি সংগ্রহ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ০১৭১৬-২৫৩২১৬

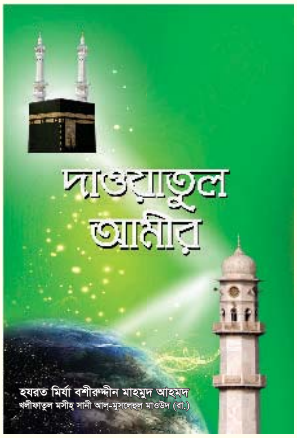

হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী আল্-মুসলেহুল মাওউদ (রা.) রচিত **‘দাওয়াতুল আমীর’**-এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

ভাষান্তর করেছেন **মাওলানা ফিরোজ আলম**।

৩১৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত বইটির **মূল্য ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ টাকা)**।

বইটি আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে।

আপনার কপিটি আজই সংগ্রহ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ০১৭১৬-২৫৩২১৬

"Love For All, Hatred For None."

Hakim Watertechnology

"Best Water, Best Life"

House hold/Official | Commercial/Industrial | Pet Bottling

46/A Kakrail (VIP Roa), 2nd Floor, Dhaka-1000,Tel: 02-9337056, Cell: 01611-338989, 01711-338989

E-mail: hakimwater@gmail.com, Web: www.hakimwatertechnology.com

সম্পাদকীয়

জলসা সালানা, ইউকে–২০১৬ সফল হোক

মহান আল্লাহ্ তা'লার আশিস ও অনুগ্রহক্রমে ১২, ১৩ ও ১৪ আগষ্ট ২০১৬ তিনদিন ব্যাপী আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ৫০তম সালানা জলসা ইউ, কে ২০১৬, যুক্তরাজ্যের হাদীকাতুল মাহদী-তে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তা'লা বিনাসরিহিল আযীয এই জলসার শুভ উদ্বোধন করবেন, ইনশাআল্লাহ্। মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়া ইন্টারন্যাশনাল এর শক্তিশালী নেট ওয়ার্কের মাধ্যমে এ জলসার অনুষ্ঠান সারা বিশ্বের পাঁচটি মহাদেশে একযোগে Live telecast হবে এবং প্রায় ২৫ কোটি আহমদীসহ গোটা বিশ্ব তা প্রত্যক্ষ করবে।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত যুক্তরাজ্যের জলসা এখন বিশ্বরূপ ধারণ করে চলছে। বিশেষ করে যুগ-খলীফার কল্যাণময় সান্নিধ্য লাভের আকাঙ্খায় বিশ্বের ২০৮ টি দেশের প্রতিনিধিবর্গ এই জলসায় এম.টি.এ-এর মাধ্যমে পরোক্ষভাবে অংশ নিবেন বলে আমরা আশা রাখি। নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের মহান খলীফার পবিত্র উপস্থিতিতে আশিসমণ্ডিত এই জলসা এক আধ্যাত্মিক মহামিলন কেন্দ্রে পরিণত হয়ে আন্তর্জাতিক মাত্রা লাভ করে। আহমদীয়া জামা'তের জলসা কোন রাজনৈতিক সমাবেশ নয় এবং পার্থিব কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আনুষ্ঠানিক সম্মেলনও এটা নয়।

আল্লাহ্ কর্তৃক মনোনীত প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী আলাইহেস সালাম-এর স্থলাভিসিক্ত খলীফার পবিত্র সান্নিধ্য ও তাঁর আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ নসিহতমূলক জীবন-প্রদায়ী পবিত্র কালাম শোনার জন্য মধুমক্ষিকার ন্যায় বিশ্বের ২০৮ টি দেশের পাগলপারা পিপাসার্ত লোকগুলো এই জলসায় যোগদান করে যুগ খলীফার প্রেম-প্রীতিপূর্ণ সহাস্য-বদন অবলোকন ও তাঁর মুখ:নিসৃত আল্লাহ্ ও রাসূল (সা.)-এর পবিত্র কালাম শ্রবণ করবেন। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ থেকেও বেশ ক'জন আহমদী এই মহতি জলসায় অংশগ্রহণ করছেন বলে জানা যায়। আমাদের দেশ থেকে যারা এই মহতি জলসায় অংশগ্রহণ করছেন, তারা হুযূর (আই.)-এর পবিত্র সাহচর্যে ধন্য হোন আর আমাদের জন্য হুযূরের আশিসপূর্ণ সওগাত বয়ে নিয়ে আমাদের মাঝে সহি সালামতে প্রত্যাবর্তন করুন, পরম করুণাময়ের সমীপে এটাই আমাদের নিবেদিত একান্ত প্রার্থনা।

জলসার বিভিন্ন অধিবেশনে হুযূর (আই.) সমকালীন সঙ্কটময় বিশ্ব পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে শান্তির রূপরেখাসহ জীবন চলার পথের দিশা-সম্বলিত আশিস বিতরণকারী বক্তব্য প্রদান করবেন, এই প্রত্যয়ে আমরা অপেক্ষমান। এছাড়া জলসার অতি গুরুত্বপূর্ণ পর্ব হচ্ছে 'আন্তর্জাতিক বয়আত' অনুষ্ঠান, যা রবিবার ১৪ আগষ্ট বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬ টায় অনুষ্ঠিত হবে, ইনশাআল্লাহ্। আর সমাপ্তি অধিবেশন শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত ৯ টা ৩০ মিনিটে।

জলসার সব অনুষ্ঠানমালা MTA-তে সরাসরি দেখে আমরা হুযূর (আই.)-এর দর্শন লাভ করব এবং হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর দোয়ার অংশীদার হবো, ইনশাআল্লাহ্। আর এই জলসা অবলোকন করে আমরা সাক্ষী হয়ে রইব আল্লাহ্ তা'লা প্রদত্ত সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণতা লাভের-যাতে বলা হয়েছে **"আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাব"**।

আসন্ন এই জলসার সার্বিক সফলতার জন্য মহান আল্লাহ্ তা'লার সমীপে দোয়া করছি এবং সেই সাথে সকল আহমদীদের প্রতি এই নিবেদন জানাচ্ছি যে, জলসার সব অনুষ্ঠান মনযোগের সাথে এমটিএ-তে সরাসরি দেখুন এবং নিজেকে ইসলামের আলোয় সমুজ্জ্বল করে গড়ে তুলুন। সেই সাথে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি উল্লেখ করতে চাই তা হলো সমগ্র বিশ্বে ধর্মের নামে রক্তপাত চলছে যদিও ইসলামের সাথে এর দূরতম কোন সম্পর্ক নেই। এই দুঃসহ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য আমাদের অনেক বেশি দোয়া করার প্রয়োজন রয়েছে কেননা এ কেবল আমাদের সাথে সম্পর্কিত নয়। বরং এর সম্পর্ক বিশ্ব মানবতার অস্তিত্বের সাথে। এছাড়া গত ২৯ জুলাই আমাদের প্রাণ প্রিয় খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ আইয়্যাদাহুল্লাহু তা'লা বেনাসরিহিল আযীয সদকা–খয়রাত করা সহ বিশেষ দোয়ার তাহরীক করেছেন।

আমাদের সকলকে ঐশী নির্দেশনায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জারীকৃত এই জলসার কল্যাণ লাভ করার এবং এক নেতার অধিনে ঐক্যবদ্ধ থেকে হুযূর (আই.) তাহরীককৃত দোয়া সমূহ যাচনার মাধ্যমে আল্লাহ্ প্রদত্ত নিশ্চিত শান্তি ও নিরাপত্তার চাঁদরে নিজদেরকে আচ্ছাদিত হয়ে থাকার তৌফিক দান করুন, আমীন।

সূচিপত্র

১৫ আগষ্ট, ২০১৬

কুরআন শরীফ ৩

হাদীস শরীফ ৪

অমৃত বাণী ৫

'বারাহীনে আহমদীয়া' ৬
হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর
১৫ জুলাই, ২০১৬ তারিখের **জুমুআর খুতবা** ৮

ইযালা-এ-আওহাম (সন্দেহ-সংশয় নিরসন) প্রণয়ন ও প্রকাশনা ১৮৯১ ১৫
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ

বিশ্বশান্তি : সমকালীন সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান ১৭
হযরত মির্যা তাহের আহমদ

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর
১ জুলাই, ২০১৬ তারিখের **জুমুআর খুতবা** ১৯

ধর্মের নামে রক্তপাত ২৬
হযরত মির্যা তাহের আহমদ

বয়আতের শর্তসমূহ এবং একজন আহমদীর দায়িত্ব ও কর্তব্য ৩১
হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)

জঙ্গিবাদের উত্থান ও আমাদের করণীয় ৩৩
মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী

জঙ্গীবাদের উত্থানের প্রেক্ষিতে নাগরিক সমাজের করণীয় মতবিবিনয় সভায় পঠিত ধারণাপত্র ৩৬
আহমদ তবশির চৌধুরী

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের উদ্যোগে "জঙ্গীবাদের উত্থানে নাগরিক সমাজের করণীয়" বিষয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত ৩৮

সংবাদ ৪০

আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ ৪৬

বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে হুযূর (আই.)-এর বিশেষ দোয়ার তাহরীক ৪৮

কুরআন শরীফ

সূরা আন্ নাহ্‌ল-১৬

وَاللّٰهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَحْيَا بِهِ
الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً
لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ﴿٦٦﴾ ع

৬৬। আর আল্লাহ্ আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণ করেছেন এবং পৃথিবীকে এর মৃত্যুর পর এর মাধ্যমে জীবিত করে তুলেছেন। নিশ্চয় এতে সেইসব লোকের জন্য রয়েছে এক বড় নিদর্শন যারা (কথা) শুনে।

وَاِنَّ لَكُمْ فِي الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ؕ نُسْقِيْكُمْ
مِّمَّا فِيْ بُطُوْنِهٖ مِنْۢ بَيْنِ فَرْثٍ وَّدَمٍ
لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِّلشّٰرِبِيْنَ ﴿٦٧﴾

৬৭। আর গবাদি পশুর মাঝেও নিশ্চয় তোমাদের জন্য এক বড় শিক্ষণীয়[১৫৫৫] নিদর্শন রয়েছে। এদের উদরস্থিত গোবর ও রক্তের মাঝ থেকে সৃষ্ট এমন বিশুদ্ধ দুধ আমরা তোমাদের পান করিয়ে থাকি যা পানকারীর জন্য সুপেয় (ও) তৃপ্তিকর।

وَمِنْ ثَمَرٰتِ النَّخِيْلِ وَالْاَعْنَابِ
تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَّرِزْقًا حَسَنًا ؕ اِنَّ فِيْ
ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿٦٨﴾

৬৮। আর খেজুর ও আঙ্গুর ফল থেকেও (আমরা তোমাদেরকে পান করাই)। এ থেকে তোমরা মাদক দ্রব্য[১৫৫৫-ক] এবং উত্তম খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করে থাক। নিশ্চয় এতে বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন লোকদের জন্য এক বড় নিদর্শন রয়েছে।

১৫৫৫। 'ইবরাতুন' অর্থ ঃ লক্ষণ, চিহ্ন বা সাক্ষ্য প্রমাণ, যার মাধ্যমে অজ্ঞতা থেকে জ্ঞানের পথে অগ্রসর হওয়া বুঝায় (লেইন)। জীবজন্তুর পেটে যে জটিল প্রস্তুতপ্রক্রিয়া চলতে থাকে এটি সেই দিকে ইঙ্গিত করেছে। গো-মহিষাদি যে ঘাস এবং লতাপাতা খায় তা এদের পেটে প্রস্তুতক্রিয়ার মধ্য দিয়ে দুগ্ধে পরিণত হয়। এইরূপ দুগ্ধপ্রস্তুতপ্রক্রিয়া নির্দেশ করছে, মানুষের প্রকৃতিক বা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বা ইচ্ছা তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না ঐগুলি ঐশী নিদর্শন বা ইলহাম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা পরিচালিত হয়।

১৫৫৫-ক। আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্ট বস্তু যতক্ষণ তার স্বাভাবিক ও খাঁটি এবং অমিশ্রিত অবস্থায় থাকে ততক্ষণ তারা বিশুদ্ধ, স্বাস্থ্যকর এবং বলবান ও পুষ্টিকর হয়ে থাকে। কিন্তু মানুষ যখনই তাদের স্বাভাবিক ব্যবহারে অযথা হস্তক্ষেপ করে তখন সে তাকে কলুষিত করে বসে। একইভাবে ঐশী শিক্ষা যতদিন অধিকৃত থাকে ততদিন পর্যন্ত তা আধ্যাত্মিক উপকারিতার উপায় হিসাবে বিরাজ করতে থাকে। কিন্তু যখনই তাতে মানুষের হস্তক্ষেপ ঘটে তখনই তা আপন প্রয়োজনিয়তা এবং উপকারিতা হারিয়ে ফেলে।

হাদীস শরীফ

মানবতার সর্বোত্তম আদর্শ হযরত মুহাম্মদ (সা.)

হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, "আমার আগমনের উদ্দেশ্য উত্তম-চরিত্র ও আদর্শের পূর্ণতা দান করা"

কুরআন ঃ

"নিশ্চয় তোমাদের এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য আল্লাহ্‌র রাসূলের মাঝে উত্তম আদর্শ রয়েছে, যে আল্লাহ্‌র ও পরকালের সাক্ষাৎ সম্পর্কে আশা রাখে এবং আল্লাহ্‌কে অনেক বেশী স্মরণ করে"।

(সূরা আল আহযাব : ২২)

হাদীস ঃ

* হযরত আমের (রা.) অত্যন্ত পুণ্যবান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি হযরত আয়েশা (রা.)-কে, জিজ্ঞাসা করলেন, "হে উম্মুল মু'মিনীন! আমাকে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর চরিত্র সম্পর্কে বলুন।" "হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, তুমি কি কুরআন পড় নাই?" হযরত আমের (রা.) বললেন, "কেন (পড়ব) না" তিনি বললেন, "হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর চরিত্র তো কুরআনই ছিল" (নিসাঈ)।

* হযরত আনাস (রা.) বলেছেন, "হযরত রাসূল করীম (সা.) ছিলেন মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম চরিত্রের অধিকারী" (মুসলিম)।

* হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, "আমার আগমনের উদ্দেশ্য উত্তম-চরিত্র ও আদর্শের পূর্ণতা দান করা" (আল আদাবুল মুফরাদ)।

* হযরত আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে আমর (রা.) বলেছেন, "নবী করীম (সা.) প্রকৃতিগতভাবেও অশ্লীল ভাষী ছিলেন না এবং ইচ্ছাকৃতভাবেও অশ্লীল ভাষী ছিলেন না" (বুখারী, কিতাবুল মানাকিব)।

এ যুগের প্রতিশ্রুত মসীহ্‌ ও ইমাম মাহদী (আ.) হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর আদর্শ সম্পর্কে উল্লেখ করে বলেন, "কুরআন শরীফে হযরত খাতামুল আম্বিয়া (সা.)-এর উত্তম চরিত্রের যে উল্লেখ রয়েছে, তা হযরত মূসা (আ.) অপেক্ষা সহস্র গুণে উত্তম। কারণ আল্লাহ্‌ তাআলা ইরশাদ করেছেন, হযরত খাতামুল আম্বিয়া (সা.)-এর মধ্যে সেই সব উত্তম-চরিত্র, গুণ একত্র হয়েছে, যেগুলি বিভিন্ন নবীর মধ্যে ছড়ানো-ছিটানো অবস্থায় ছিল। আল্লাহ্‌ তাআলা আঁ-হযরত (সা.) সম্বন্ধে ইরশাদ করেছেন, 'ইন্নাকা লা আলা খুলুকিন আযীম' অর্থাৎ নিশ্চয় তুমি অতীব মহান চরিত্রের ওপর দন্ডায়মান আছ। 'আযীম' শব্দটি দ্বারা যখন কোন বস্তুর তা'রীফ করা হয়, তখন আরবী বাক্‌ধারায় তা দ্বারা ঐ বস্তুর চরম ও পরম কামালিয়াত (পূর্ণতা) বুঝায়। মানবাত্মার মধ্যে যত উত্তম চারিত্রিক-গুণ ও মধুর আচরণ বিদ্যমান থাকা সম্ভব, ঐ সব চারিত্রিক গুণ পূর্ণ মাত্রায় মুহাম্মদীয় সত্ত্বায় বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং তাঁর এই তা'রীফ এত উচ্চাঙ্গের যে, এর চেয়ে অধিক তা'রীফ সম্ভব নয়"। (বারাহীনে আহমদীয়া)

অমৃতবাণী

মানব জীবনে অজ্ঞতা বদ্ধমূল হয়ে গেলে হোঁচট খাওয়া স্বাভাবিক অভ্যাসে পরিণত হয়

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

হে সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ! খোদা আপনাদের প্রতি করুনা করুন। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখুন, আমি এমন এক ব্যক্তি যাকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে জ্ঞান দান করা হয়েছে। আমার প্রভু প্রতিটি সূক্ষ্ম বিষয়কে বুঝা আমার জন্য সহজ করেছেন আর জীবন-যাত্রার সব সমস্যা থেকে মুক্ত করেছেন। তিনি আমাকে বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করেছেন এবং তাঁর বিশেষ স্নেহের জন্য আমাকে বেছে নিয়েছেন আর আমাকে আমার আমিত্বের গৃহ থেকে মুক্ত করে সংগোপনে তাঁর সুমহান ও বিশাল গৃহ অভিমুখে আমাকে নিয়ে গেছেন। জল-স্থল পাড়ি দিয়ে যখন আমি প্রকৃত ক্বিবলায় পৌঁছলাম এবং তাঁর মনোনীত গৃহ প্রদক্ষিণ করার সৌভাগ্য লাভ করলাম আর আমার বন্ধু ও মূর্তিমান ভালবাসা, প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ্‌র স্নেহের সুদৃষ্টি, অন্তরাত্মার প্রখরতা ও আধ্যাত্মিক রহস্যকে বুঝার ক্ষেত্রে যখন আমাকে বিশেষত্ব প্রদান করল আমি তখন আমার পূর্ণ অস্তিত্বকে তাঁর হাতে সঁপে দিলাম।

আমি তাঁর পক্ষ থেকে সব সূক্ষ্ম বিষয় ও আধ্যাত্মিক রহস্যের জ্ঞান অর্জন করেছি। বিভিন্ন মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে তাঁর পক্ষ থেকে আমাকে ব্যুৎপত্তি দেয়া হয়েছে। বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মাঝে বিদ্যমান সব বিবাদের প্রতি আমি আমার মনোযোগ নিবদ্ধ করছি। আমি সব বিতর্কের উৎস ও কারণ সন্ধান করেছি। অনুসন্ধান ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের ক্ষেত্র বাদ রাখিনি বরং সুনিশ্চিতভাবে আমি এর মূল খুঁজে বের করেছি।

আমি বুঝতে পেরেছি, **বিবাদ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে মানুষ যে ভুল-ভ্রান্তি করছে, একটি দিককে উপেক্ষা করে অন্য আরেকটি দিককে অবলম্বন করাই হলো এর মূল কারণ। প্রকৃত জ্ঞান ছাড়াই তারা একটি আঙ্গিককে বড় করে দেখে আর এর বিপরীত মতামতকে তুচ্ছ ও খাটো মনে করে। কাঙ্খিত কোন কিছুর ভালবাসায় মত্ত হলে প্রবৃত্তি এর বিরোধী সব বিষয়কে ভুলে বসে–এই হলো মানবস্বভাবের বৈশিষ্ট্য। তখন সে সহানুভূতিশীলদের সদুপদেশকেও মনোযোগ দিয়ে শুনতে চায় না বরং বেশীর ভাগ সময় তাদের বিরোধিতা করে আর তাদেরকে শত্রু মনে করে। তখন সে তার হৃদয়ের অস্বচ্ছতার কারণে তাদের সান্নিধ্যে যায় না আর তাদের কথাও মন দিয়ে শোনে না।**

এ আত্মিক বিপত্তির নানা কারণ ও হেতু রয়েছে আর বিভিন্ন পথ ও পন্থা দিয়ে এ ব্যাধির অনুপ্রবেশ ঘটে। এর সবচেয়ে বড় কারণগুলো হলো, হৃদয়ের কাঠিন্য, পাপে আসক্তি, পরকালে জবাবদিহিতার প্রতি ঔদাসীন্য এবং প্রতারক ও মিথ্যাবাদী শত্রুদের সাথে সখ্যতা। মানব জীবনে অজ্ঞতা বদ্ধমূল হয়ে গেলে হোঁচট খাওয়া তার স্বাভাবিক অভ্যাসে পরিণত হয় আর প্রবৃত্তির দাসত্বই তার অভিষ্ট লক্ষ্যে পরিণত হয়। অতএব আমরা এমন স্থায়ী পদস্খলন থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাই যা মানুষকে ধ্বংস করে দেয়। প্রায়শ এসব বদ-অভ্যাসই মানুষকে বিবাদ-বিতন্ডার সময় গভীর হঠকারিতার পথে ঠেলে দেয়। সত্যান্বেষী ও হেদায়াত সন্ধানী একজন মানুষের জন্য কু-প্রবৃত্তির খাতিরে ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হওয়া প্রকৃতপক্ষে জীবননাশী এক বিষ। এ ফাঁদে পতিত মানুষ খুব কমই রক্ষা পায়। কখনও কখনও এসব অসৎ কারণ এবং বিভ্রান্তিকর হেতুগুলো প্রচ্ছন্ন ও দৃষ্টির আড়ালে থাকে।

এসব ব্যাধিতে আক্রান্ত মানুষ তা দেখতে পায় না আর মনে করে, সে সঠিক ও ন্যায়সঙ্গত কাজ করছে। সে তড়িঘড়ি করে যখন বিতন্ডায় লিপ্ত হয় আর বিবাদ-বিসম্বাদে ক্রমশ: উগ্র হয়ে উঠে, এমন ক্ষেত্রে প্রায়শই একটি তুচ্ছ ধারণা এবং দুর্বল অভিমতকে জোরালো ও অকাট্য প্রমাণ বলে মনে করে, যার ফলে তার চালচলনে অহংকারীর হাবভাব দেখা যায়। এসব কিছুর কারণ হলো, গভীর মনোযোগের অভাব, অন্তর্দৃষ্টিহীনতা, সত্য-জ্ঞানের স্বল্পতা, সামাজিক কদাচারের দাসত্ব, রিপুর পুরোপুরি বশ্যতা স্বীকার, আধ্যাত্মিক রুচিশূন্যতা, উচ্চাকাঙ্খা সম্পর্কে নৈরাশ্য এবং জড় জগতের প্রতি পূর্ণ আসক্তি এবং এর অন্ধ অনুসরণ-অনুকরণ।

['সির্‌রুল খিলাফাহ্' পুস্তক, বাংলা সংস্করণ পৃষ্ঠা-১৩-১৪]

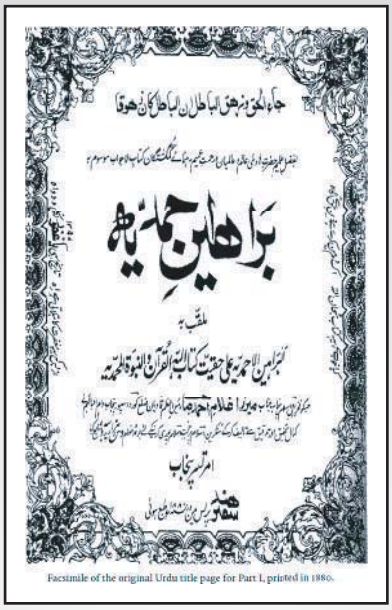

Facsimile of the original Urdu title page for Part I, printed in 1880.

‘বারাহীনে আহমদীয়া’

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)

আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত-এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

(২১তম কিস্তি)

সতর্কীকরণ

অদৃশ্য বিষয়াদী যে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হয়ে থাকে তা প্রশ্নাতিতভাবে প্রমাণিত; কেননা যুক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে এটি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, অদৃশ্য বিষয় আবিস্কার করা সৃষ্টির শক্তির ঊর্ধ্বে। আর যে বিষয় সৃষ্টির শক্তির ঊর্ধ্বে, তা খোদার পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে। অতএব এই যুক্তি থেকে প্রতিভাত হয় যে, অদৃশ্য বিষয়াদি খোদার পক্ষ থেকে প্রকাশ পেয়ে থাকে এবং এটি খোদার পক্ষ থেকে হওয়া একটি সুনিশ্চিত বিষয়।

৩য় ভূমিকা : যা সম্পূর্ণভাবে খোদা তা’লার মহাশক্তির গুণে প্রকাশ পায়, তা তাঁর সৃষ্টির মধ্য থেকে কোন সৃষ্টিই হোক অথবা শব্দ ও অর্থের নিরিখে তাঁর পক্ষ থেকে আগত কোন গ্রন্থই হোক না কেন, কোন সৃষ্টি অনুরূপ কোন কিছু সৃষ্টি করতে পারবে না– এই বৈশিষ্ট্য এর মাঝে থাকা বাঞ্ছনীয়। এই সার্বজনীন নীতি যে খোদার পক্ষ থেকে উৎসারিত সকল সৃষ্টির বেলায় প্রযোজ্য, তা দু’ভাবে প্রমাণিত হয়। প্রধানত কিয়াস বা অনুমানের মাধ্যমে, কেননা সঠিক ও সুদৃঢ় কিয়াসের দৃষ্টিকোণ থেকে খোদার স্বীয় সত্তা, গুণাবলী ও কর্মকান্ডে এক ও অদ্বিতীয় হওয়া আবশ্যক। তাঁর কোন সৃষ্টি বা কথা ও কর্মে * সৃষ্টির অংশিদারিত্ব অবৈধ। এর প্রমাণ হলো, যদি তাঁর কোন একটি সৃষ্টি বা কথা ও কর্মে সৃষ্টবস্তুর শরীক বা অংশীদারিত্ব বৈধ হয়, তাহলে সকল বৈশিষ্ট্য এবং কর্মের ক্ষেত্রেও তা বৈধ হওয়ার কথা। যদি সব গুণ ও কর্মে তা বৈধ হয় তাহলে অন্য কোন খোদার উদ্ভব হওয়াও বৈধ হতো; কেননা যে বস্তুতে বা যার মাঝে খোদার সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান তাঁর নামই খোদা। যদি কোন বস্তু বা ব্যক্তিতে স্রষ্টার কিছু বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে, তাহলেও সে কয়েকটি বৈশিষ্ট্যে স্রষ্টার অংশীদার প্রমাণিত হলো; কিন্তু বিবেক ও যুক্তির নিরিখে স্রষ্টার অংশীদারিত্ব স্পষ্টতঃই অসম্ভব। অতএব এই যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, খোদার স্বীয় সকল গুণাবলী, কথা ও কর্মে

এক ও অদ্বিতীয় হওয়া অবশ্যক।

আর তাঁর সত্তা সেসব ইতর বিষয়াদির উর্ধ্বে যা স্রষ্টার সমকক্ষতায় পর্যবসিত হতে পারে। এ দাবীর দ্বিতীয় প্রমাণ উৎকর্ষ আরোহ যুক্তির মাধ্যমে সামনে আসে। যা কিছু আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে উৎসারিত এমন প্রতিটি বস্তুর ক্ষেত্রে প্রণিধানে এ বিষয়টি সঠিক প্রমাণিত হয়েছে কেননা বিশ্বজগতের প্রতিটি খুঁটিনাটি বা অণু-পরমাণু যা খোদার পূর্ণ শক্তিবলে প্রকাশিত; এর প্রতিটিকে যদি আমরা গভীর দৃষ্টিতে দেখি, সর্বনিম্ন পর্যায় থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত যেমন মশা, মাছি ও মাকড়সা ইত্যাদি তুচ্ছাতিতুচ্ছ বস্তুনিচয়ের কথা যদি চিন্তা করি, তাহলে এসবের মাঝে এমন কোন বস্তু কখনও আমাদের চোখে পড়ে না যা সৃষ্টি করার শক্তি মানুষের রয়েছে, বরং এসব বস্তুর গঠন ও সৃষ্টিগত বিন্যাস সম্পর্কে প্রণিধানে খোদার শক্তির এমন বিস্ময়কর নিদর্শন তাদের দেহে দৃশ্যমান ও বর্তমান প্রতিভাত হয়, যা বিশ্ব স্রষ্টার অস্তিত্বের সন্দেহাতীত ও সমুজ্জ্বল প্রমাণ। এসব প্রমাণ ছাড়াও সকল বুদ্ধিমান মানুষের জন্য একথা স্পষ্ট যে, যা কিছু খোদার শক্তিশালী হাতের কল্যাণে অস্তিত্ব লাভ করেছে, অন্য কেউ যদি তা বানানোর ক্ষমতা রাখতো , তাহলে কোন সৃষ্টিই সেই প্রকৃত স্রষ্টার অস্তিত্বের পূর্ণ প্রমাণ বহন করতো না।

এছাড়া বিশ্ব স্রষ্টাকে চেনার বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে সন্দেহের দোলাচলে দুলতো। কেননা খোদার পক্ষ থেকে যেসব বস্তু উৎসারিত হয়েছে এর কোন কোনটি খোদা ছাড়া অন্য কেউও যদি বানাতে সক্ষম হয়, তাহলে এ কথার কী প্রমাণ আছে যে, অন্য কেউ সাকুল্য জিনিস বানাতে পারবে না? এখন যেহেতু দৃঢ় প্রমাণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে যে, যেসব বস্তু খোদার পক্ষ থেকে, প্রধানত সেসবের অনন্যতা, দ্বিতীয়ত সেই অনন্যতা তাদের খোদার পক্ষ থেকে প্রকাশিত হওয়ার অকাট্য প্রমাণ সাব্যস্ত হওয়া সেসবের আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে উৎসারিত হওয়ার আবশ্যকীয় শর্ত। অতএব এই গবেষণার মাধ্যমে সেসব মানুষের ভ্রান্তি স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়ে গেলো যারা বলে, ঐশীবাণী অনন্য হওয়া আবশ্যক নয় বা এর অনন্যতা এর খোদার পক্ষ থেকে আসার প্রমাণ নয়! এখানে পূর্ণযুক্তি উপস্থাপনের মানসে তাদের হৃদয়ে যে একটি সন্দেহ জাগে তা দূরীভূত করা সমীচীন বলে মনে হয়; আর তাহলো অদূরদর্শীতার কারণে তাদের হৃদয়ে এই ভ্রান্ত ধারণা বদ্ধমূল যে, পৃথিবীতে অনেক বাণী বা গ্রন্থ এমন আছে যার মত বা যার সমমর্যাদার অন্য কোন বাণী আজ পর্যন্ত সামনে আসেনি কিন্তু তা সত্ত্বেও তা খোদার বাণী বলে গণ্য হতে পারে না! অতএব স্পষ্ট হওয়া উচিত, এই সন্দেহ সঠিক ধ্যানধারণার অভাবে দেখা দিয়েছে। নতুবা এটি স্পষ্ট যে, কোন মানুষের কথা যতই স্বচ্ছ, পরিচ্ছন্ন ও স্পষ্টই হোক না কেন সে সম্পর্কে একথা বলা বৈধ হতে পারে না যে, সত্যিই তা রচনা করা মানবীয় শক্তির ঊর্ধ্বে আর রচয়িতা এক্ষেত্রে খোদার কাজ করেছে। বরং যার সামান্য পরিমান বিবেক-বুদ্ধিও আছে, সে ভালভাবে জানে মানবীয় শক্তি-বৃত্তি যা কিছু সৃষ্টি করেছে তা সৃষ্টি করা মানবীয় শক্তির উর্ধ্বে নয়, নতুবা কোন মানুষ তা বানাতে সক্ষম হতো না। যখন একটি বাণী বা গ্রন্থকে মানুষের কথা আখ্যা দিয়ে তোমরা নিজেরাই স্বীকার করেছ যে, মানবীয় শক্তি-বৃত্তি তা বানাতে সক্ষম, সেখানে প্রশ্ন দাড়ায় যে, যেখানে মানবীয় শক্তি-বৃত্তি তা প্রস্তুত করতে সক্ষম সেখানে তা অনন্য কি করে হলো? অতএব এ ধারণা সম্পূর্ণভাবে উম্মাদ ও কান্ডজ্ঞানহীন লোকদের ধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ; অর্থাৎ এক বস্তু সম্পর্কে প্রথমে বলে, তা মানবীয় শক্তি-বৃত্তি'র সৃষ্ট আবার বিড়বিড় করে বলে, এখন মানবীয় শক্তি-বৃত্তি এ বস্তুর দৃষ্টান্ত উপস্থাপনে অক্ষম ও অসমর্থ। এই উম্মাদনাপসূত কথার সারমর্ম হবে মানবীয় শক্তি-বৃত্তি কোন বস্তু বানাতে সক্ষম, আবার অক্ষমও; এছাড়া আজ পর্যন্ত কোন মানুষ এই দাবী করেনি যে, আমার কথা ও আমার সৃষ্টি খোদার কথা ও সৃষ্টির মত অতুলনীয় ও অনন্য।

আর যদি কোন নির্বোধ অহংকারী ব্যক্তি এমন দাবী করতো তাহলে তার চেয়ে উত্তম সহস্র সহস্র লেখক তার মুখে চুনকালি দেয়ার জন্য দাঁড়িয়ে যেতো। সমগ্র বিশ্বজগতকে স্বীয় বাণী বা গ্রন্থের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে ব্যর্থ ও অক্ষম আখ্যায়িত করা এবং চরম ও কঠোর ভাষায় তাদের অবিশ্বাসী, অভিশপ্ত ও জাহান্নামি সাব্যস্ত করা বরং যারা এরূপ কোন কিছু রচনা করতে অক্ষম তাদের অস্বীকারের ক্ষেত্রে (খোদার পক্ষ থেকে) মৃত্যুর শাস্তি নির্ধারণ করে স্বয়ং বারংবার এ মর্মে উদ্দীপ্ত করা যে, তারা যেন দৃষ্টান্ত উপস্থাপনে যাবতীয় প্রচেষ্টা ও পারস্পরিক জোটবদ্ধতা এবং সাহায্য-সহযোগিতায় কোন ত্রুটি না করে, আর নিজেদের প্রাণ রক্ষায় যেন সর্বশক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মোকাবিলা করে।

নতুবা কোন দৃষ্টান্ত উপস্থাপন না করেই যদিতারাঅস্বীকার করতেই থাকে, তাহলে তাদের নিজেদের ঘরকে বিরাণ, স্ত্রীদের বাঁদী এবং নিজেদের মৃতবৎ জ্ঞান করা উচিত। এমন দাবী এবং এত জোরালো দাবী কোন যুগে কোন মানুষ করেছে কি? মোটেই নয়– এটি কেবল খোদার মহিমা। অতএব যেখানে কোন মানুষ স্বীয় উক্তি বা রচনার অনন্যতার দাবীই করেনি, আপন শক্তি-বৃত্তিকে মানবীয় শক্তি-বৃত্তি হতে বেশি কিছু জ্ঞান করেনি বরং শতশত নামীদামী কবি যুদ্ধ করে মরার পথ বেছে নিয়েছে কিন্তু কুরআনের একটিমাত্র সূরার সমতূল্য কোন কিছু রচনা করতে সক্ষম হয়নি, সেখানে অনর্থক এই গো-বেচারাদের অর্থহীন লেখা বা উক্তিকে অতুলনীয় আখ্যায়িত করা এবং অসাধারণ বৈশিষ্ট্যমন্ডিত মনে করা চরম পর্যায়ের অজ্ঞতা ও অন্ধত্ব, কেননা এগুলো কেবল খোদারই বৈশিষ্ট্য, আর যে ব্যক্তি এত স্পষ্ট প্রমাণাদির উপস্থিতিতে খোদা ও মানুষের মাঝে স্পষ্ট পার্থক্য দেখেও দেখে না, সে অন্ধ এবং নির্বোধ নয়তো আর কী?

(চলবে)

ভাষান্তর: **মওলানা ফিরোজ আলম**
মুরব্বী সিলসিলাহ্

জুমুআর খুতবা

জামা'তি ওহ্‌দাদার বা কর্মকর্তাদের দায়-দায়িত্ব

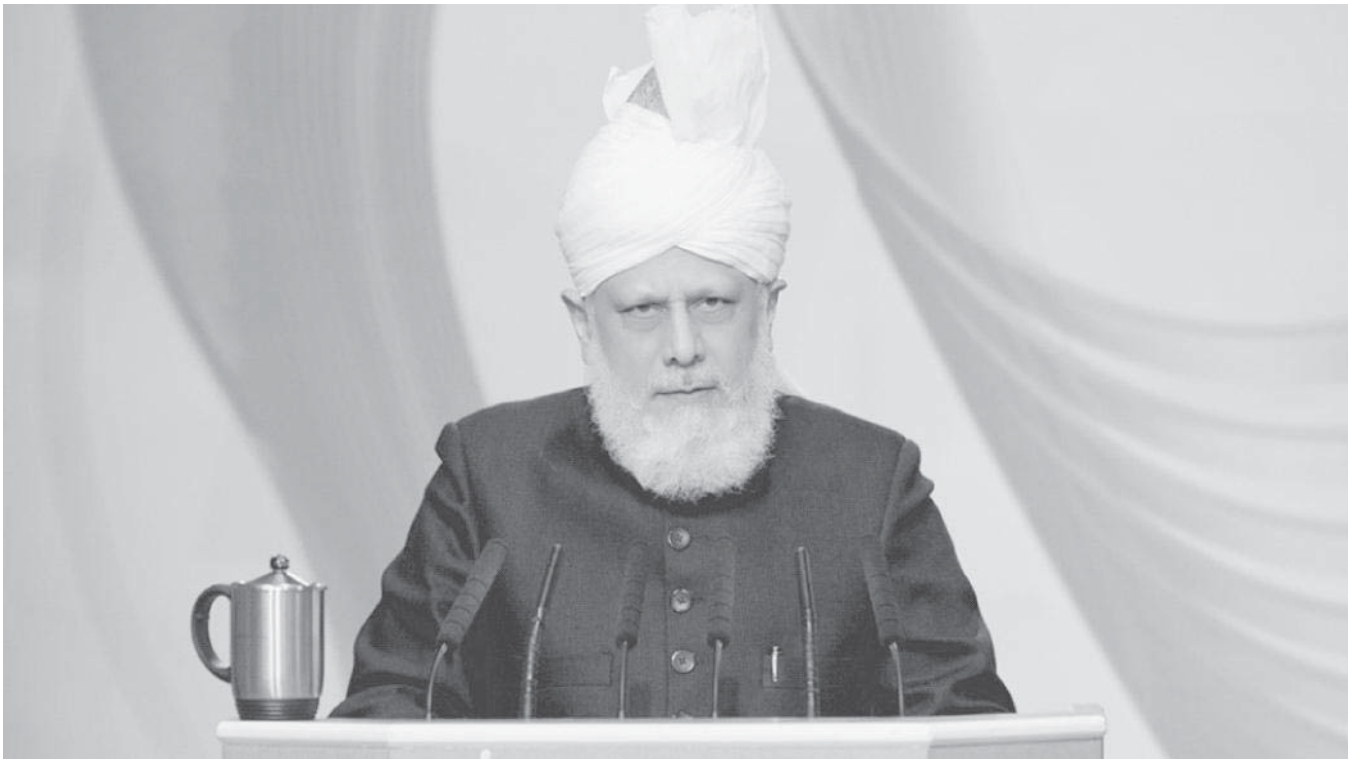

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৫ জুলাই, ২০১৬ তারিখের জুমুআর খুতবা

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۞ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۞
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۞ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۞ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۞

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, কিছুকাল পূর্বে এক খুতবায় আমি উল্লেখ করেছি যে, এ বছরটি জামাতে কর্মকর্তা নির্বাচনের বছর। এ পর্যন্ত বেশির ভাগ জায়গায়ই নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে, দেশীয় পর্যায়েও আর স্থানীয় জামাতগুলোতেও। আর নতুন কর্মকর্তারা নিজেদের দায়িত্ব বুঝে নিয়েছেন। কর্মকর্তাদের মাঝে কোন কোন ক্ষেত্রে কোন কোন জায়গায় নতুন আমীর, প্রেসিডেন্ট এবং ওহদাদার বা কর্মকর্তা নির্বাচিত হয়েছেন। কিন্তু অনেক স্থানে যারা পূর্বে কাজ করে আসছিল তাদেরকেই পুনরায় নির্বাচন করা হয়েছে। নবাগতদের যেখানে এ জন্য খোদার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত যে, খোদা তা'লা তাদেরকে জামাতের সেবার জন্য নির্বাচন করেছেন সেখানে বিনয়ের সাথে খোদার দরবারে সিজদাবনত হয়ে খোদার সাহায্যও যাচনা করা উচিত যেন তারা এই আমানতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারে যা তাদের ওপর ন্যস্ত হয়েছে।

অনুরূপভাবে যেসব কর্মকর্তাগণ পুনরায় নির্বাচিত হয়েছেন তাদেরও যেখানে খোদার দরবারে এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা তাদের পুনরায় খিদমতের সুযোগ দিচ্ছেন সেখানে খোদার দরবারে এই বিনয়াবনত দোয়াও করা উচিত যে, খোদা তা'লা তাদেরকে নিজেদের সমস্ত শক্তি-সামর্থ্য নিয়োজিত করে আমানতের এই দায়িত্ব পালনের তৌফিক দিন আর অতীত খিদমত বা পূর্বের বছর কাজ করতে গিয়ে যে আলস্য এবং উদাসীন্য প্রকাশ পেয়েছে যার কারণে তাদের ওপর ন্যস্ত আমানতের প্রতি তারা সত্যিকার অর্থে সুবিচার করতে পারে নি বা দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হয় নি, আল্লাহ্

তা'লা সেই ত্রুটি বিচ্যুতিকেও মার্জনা করুন আর নিজ অনুগ্রহ বশত আগামী তিন বছরের জন্য খিদমত বা সেবার যে সুযোগ দিয়েছেন এবং যেসব আমানত তাদের ওপর ন্যাস্ত করেছেন এই দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতেও যেন কোন আলস্য ও উদাসীন্য প্রদর্শিত না হয় এবং আমানতের প্রতি সুবিচার করার তৌফিক যেন আল্লাহ্ তা'লা তাদের দান করেন বা আমানতের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনের যেন তৌফিক দান করেন।

স্মরণ রাখা উচিত যে, জামাতী খিদমত বা জামাতের সেবা করার যে সুযোগ এটিকে ভাসা দৃষ্টিতে দেখা উচিত নয় এবং তুচ্ছ মনে করা উচিত নয়। আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তি সে ওহদাদার বা কর্মকর্তা হোক অথবা সাধারণ এক আহমদী হোক, তার এ অঙ্গীকার রয়েছে যে, সে ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দিবে। কোন ব্যক্তি ওহদাদার বা কর্মকর্তা হিসেবে যখন কোন দায়িত্ব গ্রহণ করে বা কোন দায়িত্ব যখন তার ওপর ন্যস্ত হয় সেক্ষেত্রে অন্যদের চেয়ে তার ওপর এই দায়িত্ব বেশি বর্তায় যে, সে এই অঙ্গীকার রক্ষা করবে। আর স্মরণ রাখতে হবে যে, সে এই অঙ্গীকার আল্লাহ্ তা'লার সাথে করেছে। আর অঙ্গীকার রক্ষার কথা আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বেশ কয়েক স্থানে উল্লেখ করেছেন, অঙ্গীকারের প্রতি সুবিচার করার ওপর বেশ কয়েক জায়গায় গুরুত্বারোপ করেছেন। সুতরাং সদা স্মরণ রাখবেন, আল্লাহ্ তা'লা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, তোমাদের ওপর ন্যাস্ত দায়িত্ব যা তোমরা শিরোধার্য কর তাও তোমাদের অঙ্গীকার। সুতরাং নিজেদের আমানত এবং অঙ্গীকার রক্ষা কর, এর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হও। এক জায়গায় আল্লাহ্ তা'লা যারা নিজেদের কথায় সত্য এবং তাকওয়ার ওপর বিচরণকারী তাদের লক্ষণ উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন,

وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ۚ

(সূরা আল্-বাকারা:১৭৮) অর্থাৎ যখন কোন অঙ্গীকার করে তখন তারা তা পূর্ণ করে বা রক্ষা করে। অতএব যারা জামাতী দায়িত্ব প্রাপ্ত হয় তাদের এটি একটি মৌলিক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত। তারা সবসময় সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে এবং তাকওয়ার মানকে উন্নত করার প্রচেষ্টায় রত থেকে দায়িত্ব পালন করে। তাদের সত্যের মানে যদি কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকে, তাদের তাকওয়ার মান যদি জামাতের এক সাধারণ সদস্যের জন্য আদর্শ স্থানীয় না হয় তাহলে সে নিজের অঙ্গীকার, নিজের পদ এবং আমানতের দায়িত্ব পালনের প্রতি সচেতন নয় বা মনোযোগী নয়। সুতরাং আমীর বা সদর বা প্রেসিডেন্টরা সর্বপ্রথম নিজেদের দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন, আমেলার সামনেও আর জামাতের সভ্য এবং সদস্যদের সামনেও। যারা সেক্রেটারী তরবীয়ত তাদের ওপর তরবীয়তের দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে। তরবীয়তের দায়িত্ব তখনই সঠিকভাবে পালিত হতে পারে যদি উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয়। যে কর্মী, যে দায়িত্বপ্রাপ্ত, যে অন্যদের নসীহত করবে তার নিজেরও প্রথমে তা মেনে চলতে হবে। জামাতের সদস্যদের সামনে সেক্রেটারী তরবীয়তের দৃষ্টান্ত স্থাপন করা উচিত। জামাতের তরবীয়তের দায়িত্ব, সুশিক্ষার দায়িত্ব তার ওপরই ন্যস্ত হয়।

আমি বেশ কয়েকবার বেশ কয়েক ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছি যে, তরবীয়ত বিভাগ যদি কর্মঠ ও সক্রিয় হয়ে যায় তাহলে অন্যান্য অনেক বিভাগের কাজ নিজ থেকেই সমাধা হতে পারে। জামাতের সদস্যদের তরবীয়তের বা সুশিক্ষার মান যত উন্নত হবে ততই অন্যান্য বিভাগের কাজ সহজ সাধ্য হয়ে উঠবে। যেমন সেক্রেটারী মালের কাজ সহজ হয়ে উঠবে, সেক্রেটারী উমুরে আমার কাজ সহজ হয়ে উঠবে, সেক্রেটারী তবলীগের কাজ সহজ হয়ে যাবে। একইভাবে অন্যান্য বিভাগের কাজও, যেমন কাযা বা বিচার বিভাগের কাজও সহজ হয়ে যাবে। আমি প্রায় সময় বিভিন্ন স্থানে আমেলার মিটিংয়ে বলে থাকি যে, তরবীয়তের কাজ প্রথমে নিজের ঘর থেকে আরম্ভ করুন। আর ঘর বলতে শুধু সেক্রেটারী তরবীয়তের ঘর নয় বরং মজলিসে আমেলার প্রত্যেক সদস্যের ঘরের কথা বলছি। মজলিসে আমেলার নিজেদের তরবীয়তের প্রতি সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি দেয়া উচিত। জামাতের আমীর, প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারী তরবীয়ত যে অনুষ্ঠানই প্রণয়ন করেন, তাদের সর্বপ্রথম দেখতে হবে যে, আমেলার সদস্যরা সেসব কর্মকান্ডের ওপর প্রতিষ্ঠিত কিনা।

আল্লাহ্ তা'লার যেসব মৌলিক নির্দেশাবলী রয়েছে আর মানব সৃষ্টির যে মৌলিক এবং প্রধান উদ্দেশ্য রয়েছে আমেলার সভ্য এবং সদস্যরা সেই দায়িত্ব পালন করছে কিনা। যদি তারা তা না করে থাকে তাহলে তাদের মাঝে তাকওয়া নেই। আল্লাহ্‌র অধিকার সমূহের মাঝে সবচেয়ে বড় অধিকার হলো ইবাদত। এর জন্য পুরুষদের ক্ষেত্রে নির্দেশ হলো নামায কায়েম করা। নামায বাজামাত পড়ার মাধ্যমেই নামায কায়েম হতে পারে। সুতরাং আমীর, প্রেসিডেন্ট এবং অন্যান্য ওহদাদার বা কর্মকর্তাদের উচিত নামাযের হিফাযত করে নামায কায়েম বা নামায প্রতিষ্ঠার বিষয়ে সর্বাত্মক চেষ্টা করা। এর ফলে যেখানে আমাদের মসজিদ আবাদ হবে, নামায সেন্টার আবাদ হবে বা নামাযীতে ভরে যাবে সেখানে তারা খোদার কৃপারাজিও অর্জন করবে। আর এভাবে নিজেদের ব্যবহারিক দৃষ্টান্তের কল্যাণে জামাতের সভ্য এবং সদস্যদের ও তারা তরবীয়ত করতে পারবে। তারা খোদার ফযল এবং কৃপারাজির উত্তরাধিকারী হবে, তাদের কাজে সহজসাধ্যতা সৃষ্টি হবে। তারা শুধু কথার খৈ ফুটাবে না। সুতরাং কর্মীদের সর্বপ্রথম আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত যে, তাদের কথা এবং কর্মের মাঝে কতটা মিল এবং সামঞ্জস্য রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۝

(সূরা আস্-সাফ্:৩) অর্থাৎ- হে মু'মিনগণ! তোমরা সেসব কথা কেন বল যা তোমরা নিজেরা কর না। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন,

এই আয়াতই স্পষ্ট করছে যে, পৃথিবীতে কিছু বলে সেই কাজ না করার মানুষ ছিল, আছে এবং থাকবে। আমার কথা ভালোভাবে শ্রবণ কর এবং হৃদয়ে গেঁথে নাও যে, মানুষের কথা ও আলোচনা যদি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে না হয় এবং তাতে যদি ব্যবহারিক শক্তি না থাকে তাহলে তা প্রভাব বিস্তারের সামর্থ্য রাখে না। সদা স্মরণ রেখ, শুধু বড় বড় শব্দ চয়ন আর বুলি আওড়ানো কোন কাজে আসতে পারে না যতক্ষণ কর্ম বা আমল না থাকবে। আর শুধু কথা খোদার দৃষ্টিতে কোন গুরুত্ব রাখে না।

অতএব হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

খোদার এই নির্দেশ অনুসারে স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, **আমাদের কথা এবং কাজে স্ববিরোধ থাকা উচিত নয়।** আর এই কথাকে সামনে রেখে সবচেয়ে বেশি আত্মবিশ্লেষণকারী হওয়া উচিত আমাদের কর্মকর্তাদের। যেখানে দূরত্ব বেশি বা যেখানে গুটি কতক ঘর আহমদী রয়েছে, যেখানে মসজিদ বা নামায সেন্টার নেই সেখানে ঘরেই বাজামাত নামায হতে পারে আর কার্যত এটি অসম্ভব নয়। অনেক আহমদী আছে যারা এটি মেনে চলে। তাদের ওপর রীতিমত কোন দায়িত্ব ন্যস্ত নেই, তারা আমেলার সদস্যও নন কিন্তু তারা নিজেদের ঘরে চতুস্পার্শের আহমদীদের সমবেত করে বাজামাত নামাযের ব্যবস্থা নিয়ে থাকে। যদি সচেতনতা থাকে তাহলে সবকিছু সম্ভব।

আর আমাদের প্রত্যেক কর্মকর্তার ভিতর বাজামাত নামাযের এক সচেতনতা থাকা উচিত নতুবা তারা আমানতের দায়িত্ব পালনকারী হবে না, আমানতের প্রতি সুবিচারকারী গন্য হবে না যার প্রতি কুরআনে করীম বারবার নসীহত করেছে। তাই কর্মকর্তাদের সবসময় এই কথা সামনে রাখতে হবে যে, খোদা তা'লা প্রকৃত মু'মিনের চিহ্ন বা লক্ষণ এটি উল্লেখ করেছেন যে, তারা তাদের আমানত এবং অঙ্গীকার পালনে যত্নবান। এই বিষয়ে তারা সচেতন এবং সজাগ দৃষ্টি রাখে। তারা দেখে যে, আমাদের ওপর যেই দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে, আমরা যে খিদমতের বা কাজের অঙ্গীকার করেছি সেই ক্ষেত্রে আমাদের পক্ষ থেকে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রকাশ পাচ্ছে না তো? এটি সামান্য কোন বিষয় নয়। খোদা তা'লা পবিত্র কুরআনে এই কথাও বলেছেন যে,

إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

(সূরা বনি-ইসরাঈল:৩৫) প্রতিটি আহাদ বা অঙ্গীকার সম্বন্ধে একদিন জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হতে হবে। অতএব ইবাদত একটি মৌলিক বিষয় আর মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যই এটি। এই দায়িত্ব তো আমাদের পালন করতেই হবে। এক্ষেত্রে কোনভাবে কোন কর্মকর্তার পক্ষ থেকে আলস্য প্রদর্শিত হওয়া উচিত নয় বরং কোন ব্যক্তির পক্ষ থেকেও তা প্রদর্শিত হওয়া উচিত নয়। এছাড়াও আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে যার প্রতি ওহদাদারদের বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখা উচিত। আর এসব কথা মানুষের অধিকার আর জামাতের সদস্যদের সাথে কর্মকর্তাদের আচার-আচরণ বা আচার-ব্যবহারের সাথে সম্পর্ক রাখে। আর এই কথাগুলো ওহদাদার বা কর্মকর্তাদের অঙ্গীকারের সাথেও সম্পর্ক রাখে। কোন ওহদাদার, সে কর্মকর্তা হবে এই ধারণা মাথায় বদ্ধমূল করার উদ্দেশ্যে নির্বাচিত হয় না বরং ইসলামে ওহদাদার বা কর্মকর্তা সংক্রান্ত যে ধারণা রয়েছে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন।

মহানবী (সা.) এটি এভাবে উল্লেখ করেছেন যে, জাতির নেতা জাতির সেবক হয়ে থাকে। সুতরাং এক ওহদাদার বা কর্মকর্তা বা পদাধিকারীর মানুষের বিষয়ে নিজের আমানতের প্রতি সুবিচার করা আসলে জাতির সেবক হিসেবে কাজ করার ওপরই নির্ভর করে। আর এটি তখনই সম্ভব যদি মানুষের ভিতর কুরবানী এবং ত্যাগের বৈশিষ্ট্য থাকে। তার মাঝে যদি বিনয় ও নম্রতা থাকে। তার ধৈর্য্যের মান যদি অন্যদের চেয়ে উন্নত হয়। অনেক সময় ওহদাদার বা কর্মকর্তাদের কথাও শুনতে হয়। যদি শুনতে হয় তাহলে শুনা উচিত। কর্মকর্তা নিজেই যাচাই করতে পারে যে, তার সহ্যের শক্তি কতটুকু রয়েছে। তার বিনয় কোন মানের বা নম্রতা কোন পর্যায়ে রয়েছে।

অনেক সময় এমন ওহদাদার বা কর্মকর্তার বিষয়াদিও সামনে আসে যাদের মাঝে বিন্দুমাত্র সহ্যশক্তি নেই বা থাকে না। যদি অন্য কেউ অসৌজন্যমূলক আচরণ করে তাহলে সেই ওহদাদার বা কর্মকর্তাও একই ব্যবহার আরম্ভ করে দেয়। সাধারণ কোন সদস্য যদি অভদ্র বা অশিষ্ট হয়ে থাকে তাহলে এতে সেই ব্যক্তির কোন ক্ষতি হয় না বা তার কিছু যায় আসে না। সর্বোচ্চ এটিই বলা হবে যে, এই ব্যক্তির চরিত্র অত্যন্ত নিম্ন মানের। কিন্তু কর্মকর্তাদের মুখ থেকে যখন মানুষের সামনে নোংরা শব্দ বের হয় তখন ওহদাদার বা কর্মকর্তার নিজের সম্মান এবং মর্যাদারও হানি হয় আর একই সাথে জামাতের সদস্যদের ওপরও এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

জামাতের যে মান হওয়া উচিত বা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাদেরকে যে মানে দেখতে চান সেই ক্ষেত্রে যদি একটি দৃষ্টান্তও এমন সামনে আসে তাহলে তা জামাতের দুর্নাম হওয়ার কারণ হতে পারে আর হয়ও। আর এমন দৃষ্টান্ত অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়। এমনকি মসজিদেও ঝগড়া বিবাদ শুরু হয়ে যায়। আর শিশুদের এবং যুবক শ্রেণীর ওপর এর খুবই ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের কাছে কি চান আর ত্যাগের উন্নত মান প্রতিষ্ঠাকারীদের কথা আল্লাহ্ তা'লা কিভাবে উল্লেখ করেছেন তা দেখুন।

এক জায়গায় তিনি বলেন,

وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ

(সূরা আল্-হাশর:১০) অর্থাৎ মু'মিন তারা যারা নিজেদের ধর্মীয় ভাইদের নিজ প্রাণের ওপর প্রাধান্য দেয়। আনসাররা মুহাজিরদের জন্য এই দৃষ্টান্তই স্থাপন করেছেন। আর এটিই আমাদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ। নিজ প্রাণের ওপর প্রাধান্য দেয়া তো বহুদূরের কথা বা অনেক বড় কথা,অনেক সময় অন্যের যে প্রাপ্য আছে তাও পুরোপুরি প্রদান করা হয় না। মানুষের কিছু ঝগড়া-বিবাদ তাদের কাছে অর্থাৎ কর্মকর্তাদের কাছে আসে বা কেন্দ্র হতে রিপোর্ট প্রেরণের জন্য কিছু বিষয় পাঠানো হলে অনেক অসাবধানতার সাথে রিপোর্ট প্রেরণ করা হয়। সঠিকভাবে তদন্ত না করেই রিপোর্ট পাঠিয়ে দেয়া হয়। বা বিষয়কে এতটা দীর্ঘ সূত্রিতার মুখে ঠেলে দেয়া হয় যে, কোন অভাবীর অভাব মোচন সংক্রান্ত যদি কোন আবেদন পত্র আসে তাহলে সময়মত রিপোর্ট না আসার কারণে সেই অভাবীর ক্ষতি হয়ে যায় বা তাকে কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়।

কোন কোন কর্মকর্তা ব্যস্ততার অজুহাতও দেখিয়ে থাকে। আর কারো কারো কাছে কোন অজুহাত থাকে না, শুধু অমনোযোগই এর মূল কারণ। যদি তাদের নিজস্ব স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় হয় বা কোন নিকটাত্মীয়ের বিষয় হয় তখন তাদের প্রিফারেন্সেস বা পছন্দের মানদন্ড বদলে যায়। সুতরাং প্রকৃত কুরবানী এবং ত্যাগের প্রেরণা, আমানতের প্রতি সত্যিকার অর্থে সুবিচার করা বা শ্রদ্ধাশীল হওয়ার অর্থ হলো এক গভীর সচেতনতার সাথে অন্যের কাজে আসা। ত্যাগের এই বৈশিষ্ট্য নিয়ে আর অন্যের কষ্টকে নিজের কষ্ট মনে করে যদি কাজ করা হয় তাহলে জামাতের সাধারণ সদস্যদের কুরবানী ও ত্যাগের মানও উন্নত হবে। পরস্পরের অধিকার খর্ব করার পরিবর্তে অধিকার প্রদানের প্রতি মনোযোগ

নিবদ্ধ হবে। আমরা অমুসলিমদের সামনে বলে থাকি যে, পৃথিবীতে শান্তি তখনই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে যদি সকল পর্যায়ে অধিকার কুক্ষিগত করার পরিবর্তে অধিকার দেয়ার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হয়। কিন্তু আমরা নিজেরাই যদি এই মানে উপনীত না থাকি তাহলে আমরা এমন একটি কাজ করব যা খোদার দৃষ্টিতে অপছন্দনীয় হবে।

আরেকটি বৈশিষ্ট্য যা বিশেষভাবে কর্মকর্তাদের মাঝে থাকা উচিত তা হলো বিনয়। আল্লাহ্ তা'লা রহমান খোদার বান্দাদের যেই পরিচয় কুরআনে তুলে ধরেছেন তা হলো

يَمْشُوْنَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا

(সূরা আল্-ফুরকান:৬৪) তারা ভূপৃষ্ঠে বড় বিনয়ের সাথে চলাফেরা করে। এরও উন্নত দৃষ্টান্ত আমাদের ওহদাদার বা কর্মকর্তাদের মাঝে পরিদৃষ্ট হওয়া উচিত। যে যত বড় পদে নিযুক্ত হবে তার ততই সেবার চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে মানুষের সাথে সাক্ষাতে বিনয় প্রদর্শন করা উচিত আর এটিই প্রকৃত বড় হওয়া। মানুষ অবলোকন করে আর অনুভব ও করে যে, কর্মকর্তার আচরণ কেমন। অনেক সময় মানুষ আমাকে লিখেও পাঠায় যে, অমুক কর্মকর্তার আচরণ সাধারণত এমন কিন্তু আজকে আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি যে, সেই ওহদাদার বা কর্মকর্তা আমাকে শুধু সালামই করেনি বরং আমি কেমন আছি তাও জিজ্ঞেস করেছে এবং খুব সুন্দর ব্যবহার করেছে। তার আচার-আচরণ দেখে আমার ভালো লেগেছে। আর এতে সেই কর্মকর্তা যে বড় সেটিই প্রকাশ পেয়েছে।

সুতরাং জামাতের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণীই এমন যারা কর্মকর্তাদের স্নেহপূর্ণ এবং কোমল ও নমনীয় আচরণেই সন্তুষ্ট হয়ে সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত হয়ে যায়। যদি কোন কর্মকর্তার হৃদয়ে নিজের পদের অহংকারে কোন প্রকার আত্মম্ভরিতা বা গর্ব দানা বাধে তাহলে তাকে স্মরণ রাখতে হবে যে, এই অভ্যাস খোদা থেকে দূরে ঠেলে দেয়। আর মানুষ যদি খোদা থেকে দূরে সরে যায় তাহলে তার কাজে কোন প্রকার বরকত বা কল্যাণ অবশিষ্ট থাকে না। সুতরাং ধর্মের কাজ সম্পূর্ণভাবে খোদার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। খোদার সন্তুষ্টিই যদি না থাকে তাহলে এমন ব্যক্তি জামাতের জন্য কল্যাণকর হওয়ার পরিবর্তে ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে।

তাই ওহদাদার বা কর্মকর্তাদের সবসময় এই দৃষ্টিকোণ থেকে আত্মজিজ্ঞাসা করা উচিত যে, তাদের মাঝে বিনয় এবং নম্রতা আছে কিনা। আর যদি থেকে থাকে তাহলে কতটা। রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, কোন ব্যক্তি যত বেশি বিনয় এবং নম্রতা অবলম্বন করে খোদা তাকে ততই মহান মর্যাদায় ভূষিত করেন। তাই প্রত্যেক কর্মকর্তার স্মরণ রাখা উচিত যে, খোদা তা'লা যদি তাকে জামাতের সেবার সুযোগ দিয়ে থাকেন তাহলে এটি খোদার একান্ত অনুগ্রহ। আর এই অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা হবে তার নিজের মাঝে অধিক বিনয় এবং নম্রতা সৃষ্টি হওয়া। যদি তা না হয় তাহলে খোদার এহসান বা অনুগ্রহরাজির কৃতজ্ঞতা প্রকাশিত হয় না।

অনেক সময় দেখা গেছে যে, মানুষ সাধারণ অবস্থায় সাক্ষাত করতে গিয়ে পরম বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করে, মানুষের সাথে সুন্দরভাবে সাক্ষাত করে। কিন্তু নিজের অধীনস্ত বা সাধারণ মানুষের সাথে যখন কোন কর্মকর্তার মতভেদ হয় তখন তাৎক্ষনিকভাবে তাদের কর্মকর্তা সুলভ যেই অহংকার আছে তা জাগ্রত হয় আর বড় কর্মকর্তা হওয়ার আত্মম্ভরিতায় পুনরায় নিজের অধীনস্তের সামনে আত্মম্ভরিতাপূর্ণ আচরণ প্রকাশ পায়। বিনয় এটি নয় যে, যতক্ষণ কোন ব্যক্তি আপনার সামনে জ্বি হুজুর জ্বি হুজুর করবে বা মতভেদ করবে না ততক্ষণ আপনি বিনয় প্রকাশ করবেন। এটি কৃত্রিম বিনয়। প্রকৃত চিত্র বা প্রকৃত রূপ তখন প্রকাশ পায় যখন মতভেদ দেখা দেয়। অধীনস্ত যখন কোন কর্মকর্তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কথা বলে তখন সেই মতামতকে সত্যিকার অর্থে বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। সুতরাং এই বিনয়ের মাধ্যমে বড় মনোবলের ও প্রমাণ পাওয়া যায় আর এমনটি হলেই এই বিনয় সত্যিকার বিনয় গন্য হবে। ওহদাদার বা কর্মকর্তাদের সবসময় খোদার এই নির্দেশ সামনে রাখা উচিত যে,

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ

(সূরা লুকমান:১৯) অর্থাৎ আর রাগের বশবর্তী হয়ে মানুষের সামনে গাল ফোলাবে না এবং পৃথিবীতে অহংকারের সাথে চলাফেরা করবে না। আমি মতভেদের কথা বলেছি। এ সম্পর্কে আমি এটিও স্পষ্ট করতে চাই যে, জামাতের নিয়ম-কানুন বা রুলস-রেগুলেশন আমীরকে এই অধিকার প্রদান করে যে, কোন কোন সময় আমেলার পরামর্শের বিরুদ্ধে নিজের ইচ্ছা অনুসারে তিনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। কিন্তু সব সময় সবাইকে সাথে নিয়ে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করা উচিত আর পরামর্শের ভিত্তিতে ও সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত এবং কাজ হওয়া উচিত।

অনেক সময় আমীররা এই সুযোগকে প্রয়োজনের অতিরিক্তভাবে ব্যবহার করে। এই সুযোগ বা এই অধিকার চরম পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করা উচিত, যেখানে জানা থাকে বা যেখানে স্পষ্ট হয় যে, এতেই জামাতের স্বার্থ নিহিত আর সেখানে

রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, কোন ব্যক্তি যত বেশি বিনয় এবং নম্রতা অবলম্বন করে খোদা তাকে ততই মহান মর্যাদায় ভূষিত করেন। তাই প্রত্যেক কর্মকর্তার স্মরণ রাখা উচিত যে, খোদা তা'লা যদি তাকে জামাতের সেবার সুযোগ দিয়ে থাকেন তাহলে এটি খোদার একান্ত অনুগ্রহ।

আমেলার সামনেও এটি স্পষ্ট করা উচিত। জামাতের বৃহত্তর স্বার্থকে সামনে রেখে এমনটি হওয়া উচিত। আর এর জন্য দোয়ার মাধ্যমে খোদার সাহায্যও যাচনা করা উচিত। শুধু নিজের বিবেক ও বুদ্ধির ওপর নির্ভর করা উচিত নয়। স্মরণ রাখা উচিত যে, প্রেসিডেন্টদের এই অধিকার বা এই সুবিধা নেই, এমনকি ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট হলেও না। আমেলার মতামতকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে নিজের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত করার সেই অধিকার প্রেসিডেন্টের নেই। নিজ নিজ কর্ম গন্ডি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের জন্য কর্মকর্তাদের উচিত হবে রুলস-রেগুলেশন পাঠ করা এবং বুঝা। তারা যদি রুলস-রেগুলেশন এবং জামাতের নিয়ম-কানুন অনুসারে কাজ করে তাহলে অনেক ছোট ছোট সমস্যা যা আমেলার মাঝে বা জামাতের সদস্যদের জন্য অস্বস্তির কারণ হয় তা আর সামনে আসবে না।

আরেকটি বিশেষত্ব যা কর্মকর্তাদের থাকা উচিত তাহলো অধীনস্তদের সাথে সুন্দর এবং সদ্ব্যবহার করা। জামাতের বেশিরভাগ কাজ স্বেচ্ছাসেবার ভিত্তিতে হয়ে থাকে। জামাতের সভ্য এবং সদস্যরা জামাতের কাজের জন্য নিজেদের সময় দিয়ে থাকে। তারা সময় দেন কেননা তারা খোদার সন্তুষ্টির সন্ধানী, তারা সময় দেন কেননা জামাতের সাথে তাদের সুসম্পর্ক এবং ভালোবাসা রয়েছে। সুতরাং ওহদাদার বা কর্মকর্তাদেরও সহকর্মীদের আবেগ অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত, তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করা উচিত আর আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশও এটিই। সদ্ব্যবহার বা সুন্দর ব্যবহারের মাধ্যমে নিজের নায়েব এবং অধীনস্তদের কাজ শিখানোর চেষ্টা করা উচিত, যেন জামাতী কাজ সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য সব সময় কর্মী বাহিনী সামনে আসে বা আসতে থাকে। জামাতের কাজ আল্লাহ্ তা'লা নিজেই পরিচালিত করে থাকেন কিন্তু যদি কর্মকর্তা বা ওহদাদার, যারা কাজের অভিজ্ঞতা রাখে, তারা যদি কর্মী বাহিনীর দ্বিতীয় লাইন প্রস্তুত করেন তাহলে তারা এই কাজের জন্যও পুরস্কার পাবেন।

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমার বা পূর্বের কোন খলীফার কখনও এই চিন্তা হয়নি যে, জামাতের কাজ কিভাবে চলবে? এ সম্পর্কে মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে খোদার প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, তিনি ইনশাআল্লাহ্ নিষ্ঠাবান কর্মী বাহিনীর যোগান দিতে থাকবেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর যুগে এক কর্মকর্তার ধারণা ছিল যে, আমার বুদ্ধিমত্তা, কর্মপন্থা আর পরিশ্রমের কারণে জামাতের আর্থিক ব্যবস্থা সুচারুরূপে পরিচালিত হচ্ছে। এই কথা যখন খলীফা সালেস (রাহে.)-র কর্ণগোচর হয় তখন তিনি প্রথম ব্যক্তিকে অপসারণ করে এমন এক ব্যক্তিকে সেই কাজে নিযুক্ত করেন যার অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ের আদৌ কোন জ্ঞান ছিল না। কিন্তু এটি যেহেতু খোদার কাজ আর খলীফায়ে ওয়াক্তের সাথে খোদার যে ব্যবহার হয়ে থাকে সে কারণে সেই নতুন কর্মকর্তা যিনি কিছুই জানতেন না তার কাজে এতটা বরকত সৃষ্টি হয় যা পূর্বে কখনও ভাবাও যেত না।

সুতরাং কর্মকর্তাদের আসলে খোদা তা'লাই কাজের সুযোগ দেন। জামাতী কর্মীদের খোদা তা'লাই খিদমতের সুযোগ দেন। যারা ওয়াকেফে জিন্দেগী তাদেরকে জামাত এবং ধর্মের সেবা করে খোদার কৃপাভাজন হওয়ার সুযোগ আল্লাহ্ তা'লাই দেন, নতুবা কাজ তো আল্লাহ্ তা'লাই করছেন কেননা এটি তাঁর প্রতিশ্রুতি। তাই কারো মাথায় এই ধারণা জাগ্রত হওয়া উচিত নয় যে, আমার অভিজ্ঞতা এবং আমার জ্ঞান জামাতের কাজ পরিচালিত করছে বা জামাতের কাজ করছে বা আমার অভিজ্ঞতা এবং আমার জ্ঞান জামাতের কাজ সমাধা করতে পারে বা চালাতে পারে। খোদা তা'লার ফযল বা কৃপাই জামাতের কাজ চালাচ্ছে বা করছে। আমাদের অনেক দুর্বলতা এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি আর ঘাটতি এমন রয়েছে যে, যদি ইহ জাগতিক কাজ হয় তাহলে তাতে সেই বরকত দেখা দিতেই পারে না এবং সেই ফলাফল প্রকাশ পেতেই পারে না। কিন্তু খোদা তা'লা দুর্বলতা ঢেকে রাখেন আর স্বয়ং ফিরিশতাদের মাধ্যমে তিনি সাহায্য করেন।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ তবলীগের কাজকেই নিন। এক্ষেত্রে এই পাশ্চাত্যেই আল্লাহ্ তা'লা এমন কর্মী বাহিনী দিয়েছেন যারা এখানেই বড় হয়েছে। এমন যুবক কর্মী বাহিনী আল্লাহ্ তা'লা দান করেছেন যারা ব্যক্তিগতভাবে জ্ঞান অর্জন করার পর বিরোধীদের মুখ বন্ধ করে। তারা এমনভাবে উত্তর দেয় যে, শত্রুরা আশ্চর্য হয়ে যায়। এছাড়া অনেক যুবক এমন আছে যাদের এমন উত্তরে বিরোধীরা লেজগুটিয়ে পালানো ছাড়া অন্য কোন উপায় বা রাস্তা খুঁজে পায় না। সুতরাং ওহদাদার বা কর্মকর্তাদের ধর্মের খিদমতের সুযোগকে খোদার কৃপা জ্ঞান করা উচিত। নিজের কোন অভিজ্ঞতা বা যোগ্যতাকে এর কারণ মনে করা উচিত নয়।

এরপর কর্মকর্তাদের মাঝে আরেকটি বৈশিষ্ট্য যা থাকা উচিত তাহলো, হাস্যোৎফুল্লতা এবং সুন্দর ব্যবহার করা। আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا

(সূরা আল্-বাকারা: ৮৪) অর্থাৎ মানুষের সাথে কোমল আচরণ কর এবং উত্তম ব্যবহার কর। অতএব এটিও একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য যা ওহদাদার বা কর্মকর্তাদের মাঝে অনেক বেশি থাকা উচিত। যখনই অধীনস্তদের সাথে এবং সহকর্মীদের সাথে কথাবার্তা বলেন বা অনুরূপভাবে অন্যদের সাথে যখন কথা বলেন তখন তাদের এই বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত যে, তাদের পক্ষ থেকে যেন উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। অনেক সময় প্রশাসনিক কারণে কঠোর ভাষায় কথা বলতে হয় বা বলার প্রয়োজন দেখা দেয় কিন্তু এটি কেবল চরম পরিস্থিতিতে হতে পারে। যদি ভালোবাসার সাথে কাউকে বুঝানো হয়,কর্মকর্তা বা ওহদাদারগণ যদি মানুষের মাঝে এই চেতনাবোধ জাগ্রত করে যে, আমরা তোমাদের প্রতি সহানুভূতি রাখি, তাহলে শতকরা নিরানব্বই ভাগ মানুষ এমন যারা বিষয় বুঝে যায় এবং সহযোগিতায় সম্মত হয়ে যায়। এর কারণ হলো জামাতের সাথে তাদের একটা সম্পর্ক আছে। কিন্তু বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো মানুষের মাঝে এই সচেতনতা সৃষ্টি করা বা মানুষের মাঝে এই চেতনাবোধ জাগ্রত হওয়া যে, ওহদাদার বা কর্মকর্তা বা পদাধিকারীরা আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল। মানুষের সাথে কোমলতার সাথে কথা বলুন। কোন ভুল-ভ্রান্তির কারণে শুরুতেই এত কঠোরভাবে ধৃত করবেন না যে, অন্য ব্যক্তি নিজের অবস্থান স্পষ্ট করারই সুযোগ পাবে না, এমনটি যেন না হয়।

হ্যাঁ, যারা অভ্যস্ত অপরাধী, যারা বার বার ভুল করে, বার বার ফিতনা এবং অশান্তির কারণ হয়, তাদের সাথে অবশ্যই কঠোর

আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তি সে ওহদাদার বা কর্মকর্তা হোক অথবা সাধারণ এক আহমদী হোক, তার এ অঙ্গীকার রয়েছে যে, সে ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দিবে।

ব্যবহার করতে হয়, কিন্তু এর জন্যও পুরো তদন্ত হওয়া আবশ্যক। আর একই সাথে এই যে কঠোরতা তা যেন কোনভাবেই ব্যক্তিগত শত্রুতায় পর্যবসিত না হয় বরং যদি সংশোধনের উদ্দেশ্যে কঠোর ব্যবহার করতে হয় তাহলেই তা করা উচিত। মহানবী (সা.) একবার তাঁর নিজের নিযুক্ত ইয়ামেনের গভর্নরকে নসীহত করেন যে, মানুষের জন্য সহজসাধ্যতা সৃষ্টি কর, কাঠিন্য নয়, ভালবাসা এবং আনন্দের প্রসার কর, ঘৃণার বিস্তার যেন না হয়। অতএব এটি এমন নসীহত যা ওহদাদার বা কর্মকর্তা ও জামাতের সভ্য এবং সদস্যদের আন্তঃসম্পর্কের মাঝে সৌন্দর্য সৃষ্টি করে আর এর ফলে জামাতের সদস্যদের মাঝে পারস্পরিক আবেগ অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার প্রেরণা এবং চেতনাবোধ জাগ্রত হবে।

তাই কর্মকর্তাদের ওপর এটি অনেক বড় দায়িত্ব বর্তায়, বিশেষ করে আমীর, প্রেসিডেন্ট এবং তরবিয়ত বিভাগ আর সিদ্ধান্তকারী বা রায় প্রদানকারী বিভাগের দায়িত্ব হলো মানুষের জন্য সহজসাধ্যতার পন্থা সন্ধান করা। কিন্তু এটিও স্মরণ রাখবেন যে, খোদার নির্দেশের গন্ডির মাঝে থেকে এই রীতি অনুসরণ করতে হবে। দুনিয়াদার বা দুনিয়ার কীটদের মত নয় যারা সহজ সাধ্যতা সৃষ্টির জন্য খোদার নির্দেশাবলীকে অবজ্ঞা করে থাকে। শরীয়তের চতুর্সীমার মাঝে থেকে, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিকে অগ্রগণ্য করে বান্দাদের প্রাপ্যও দিতে হবে আর নিজেদের অঙ্গীকার এবং আমানতেরও রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। আমি যেভাবে বলেছি যে, রুলস এবং রেগুলেশনের বই বা নিয়ম-কানুন সংক্রান্ত বই সবার দেখা উচিত। নিজের বিভাগের সংশ্লিষ্ট কাজের জ্ঞান অর্জন করা উচিত। প্রত্যেক ব্যক্তির জানা উচিত যে, তার কাজের সীমা-পরিসীমা কতটুকু। অনেক সময় অনেক কর্মকর্তা তাদের কাজের সীমার জ্ঞানই রাখে না।

এক বিভাগ একটি কাজ করে অথচ রুলস-রেগুলেশনে বা নিয়ম-কানুনে সেই কাজের দায়িত্ব হলো অন্য বিভাগের। অথবা অনেক সময় দু'বিভাগের কাজের পার্থক্য এত সূক্ষ্ম হয়ে থাকে যে, চিন্তা না করেই দু'টো বিভাগ একটি অন্যটির গন্ডিতে নাক গলানো আরম্ভ করে। সম্প্রতি এখানে যুক্তরাজ্যের মজলিসে আমেলার সাথে আমার মিটিং হয়েছে, সেখানে আমি বুঝতে পেরেছি যে, এই সূক্ষ্ম পার্থক্য না বুঝার কারণে বিনা কারণে বা অযথা বিতর্ক আরম্ভ হয়ে যায়। যদি রুলস-রেগুলেশন পড়া হয় তাহলে এভাবে সময় নষ্ট হওয়ার কথা নয়। যেমন তবলীগ বিভাগের তবলীগি পরিকল্পনাও হাতে নিতে হবে এবং যোগাযোগও করতে হবে বা রাবেতা করতে হবে আর যোগাযোগও রাবেতার মাধ্যমে তবলীগের কাজ প্রসারতা লাভ করবে।

অনুরূপভাবে উমুরে খারেজা বিভাগ ও রয়েছে, তাদেরকে ও যোগাযোগ করতে হয় এবং জামাতকে পরিচিত করতে হয়। উভয়টির গন্ডি পৃথক। এক বিভাগ তবলীগি উদ্দেশ্যে যোগাযোগ করবে আর দ্বিতীয় বিভাগ যোগাযোগ করবে গণযোগাযোগের মানসে, সম্পর্কের গন্ডিকে প্রসারিত করা হবে তাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু মূল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য হলো জামাতের পরিচিতি এবং ধর্মের প্রতি মানুষকে পথের দিশা দেয়া যেন মানুষকে এক আল্লাহ্‌র দিকে এনে তাদের ইহ এবং পরকালকে সুনিশ্চিত করার জন্য আমরা চেষ্টা করতে পারি। আর পৃথিবী যে শান্তির জন্য হাহাকার করছে সেদিকেও তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত। জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে কোন বাহবা নেয়া বা কুড়ানো আমাদের উদ্দেশ্য নয়, আসল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ্ তা'লাকে সন্তুষ্টকরা এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করা। যদি এই বিভাগগুলো পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করে তাহলে বহুগুণ বেশি ফলাফল আসতে পারে।

এরপর অনেক জায়গা থেকে এই দৃষ্টিভঙ্গীও প্রকাশ করা হয় যে, বিভিন্ন বিভাগের বাজেট সঠিকভাবে প্রণয়ন করা হয় না। প্রত্যেক বিভাগের বাজেট যা শূরায় পাশ হয়ে থাকে তা দেয়া উচিত আর সংশ্লিষ্ট সেক্রেটারীর সেই বাজেট খরচের অধিকার ও থাকা উচিত। হ্যাঁ, সেক্রেটারীর সারা বছরের কাজের পরিকল্পনা আমেলায় উপস্থাপন করা আবশ্যক হবে এবং সেই পরিকল্পনা অনুসারে খরচ হতে হবে আর প্রত্যেক কাজের অগ্রগতির কথা প্রত্যেক মিটিং-এ খতিয়ে দেখা উচিত আর কাজের পরিকল্পনায় যদি কোন পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় বা কারো মনোযোগ যদি উন্নতি, অগ্রগতি বা প্রোগ্রেসের প্রতি থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে তা নিয়ে ও চিন্তা করা উচিত বা ভাবা উচিত।

এরপর আমীর, প্রেসিডেন্ট এবং জামাতী সেক্রেটারীদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল, কেন্দ্র থেকে যখন কোন দিক-নির্দেশনা বা সার্কুলার আসে তখন তাৎক্ষণিকভাবে পুরো মনোযোগসহকারে সেগুলোকে কাজে রূপায়িত করা উচিত এবং জামাতের মাধ্যমে করানো উচিত। কোন কোন জামাত সম্পর্কে অভিযোগ আসে যে, কেন্দ্রীয় দিক-নির্দেশনার ওপর পুরোপুরি আমল করা হয় না। কোন দিক-নির্দেশনা সম্পর্কে কোন বিশেষ দেশ বা জামাতের দেশীয় কোন কারণে যদি দ্বিধাদ্বন্দ থাকে তাহলেও তাদের তাৎক্ষণিকভাবে কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ করে পরিস্থিতি অনুসারে পরিবর্তনের প্রস্তাব করা উচিত। আর এ কাজ জামাতের আমীর বা প্রেসিডেন্টের কাজ। কিন্তু কোনভাবেই যা বৈধ নয়, যা যুক্তিযুক্ত নয়, তাহলো নিজের বুদ্ধির ভিত্তিতে সেই দিক নির্দেশনাকে একপাশে চাপা দিয়ে রাখা, আর তার ওপর আমল না করানো আর কেন্দ্রকেও অবহিত না করা। কোন আমীর বা প্রেসিডেন্ট-এর এমন আচরণ কেন্দ্রের প্রতি অবজ্ঞাসূচক আচরণ হিসেবে গণ্য হবে। আর এ প্রসঙ্গে কেন্দ্র তখন ব্যবস্থাও নিতে পারে।

মুসী বা ওসীয়্যতকারীদের সম্পর্কেও আমি এখানে বলতে চাই, ওসীয়্যতকারীদের প্রথম কথা হিসেবে স্মরণ রাখা উচিত যে, নিজেদের চাঁদা নিয়মিত প্রদান করা বা এর হিসাব রাখা প্রত্যেক মুসীর ব্যক্তিগত দায়িত্ব। কিন্তু কেন্দ্রীয় অফিস এবং সংশ্লিষ্ট সেক্রেটারীর ও দায়িত্ব হলো প্রত্যেক মুসীর হিসাব কমপ্লিট বা সম্পূর্ণ রাখা আর প্রয়োজনে তাদেরকে স্মরণ করানো যে, তাদের চাঁদার প্রকৃত পরিস্থিতি বা স্থিতি কি। দেশীয় জামাতের কাজ হলো স্থানীয় জামাতের সেক্রেটারীদের এ্যাক্টিভ করা বা সক্রিয় করা যেন প্রত্যেক মুসীর সাথে তাদের যোগাযোগ থাকে।

অনেক সময় দেখা গেছে যে, কোন বিষয়ে কোন ব্যক্তি সম্পর্কে রিপোর্ট চেয়ে পাঠানো হয় আর সে ব্যক্তি ওসীয়্যতকারী হয়ে থাকে, আর রিপোর্টে লিখে দেয়া হয় যে, এই ব্যক্তি এত দিন থেকে ওসীয়্যতের চাঁদা দেয় নি। যখন জিজ্ঞেস করা হয় যে, ওসীয়্যতের চাঁদা যদি না দিয়ে থাকে তাহলে তার ওসীয়্যত কিভাবে বহাল রইল, তখন তদন্তে দেখা যায় যে, ওসীয়্যতকারীর কোন দোষ ছিল না, সে চাঁদা দিয়েছে ঠিকই কিন্তু যারা রেকর্ড রাখে তারা অফিসে সঠিক রেকর্ড রাখে নি। এমন রিপোর্ট বিনা কারণে ওসীয়্যতকারীর জন্য ব্যতিব্যস্ততা এবং অস্বস্তির কারণ হয়। দ্বিতীয়ত জামাতি ব্যবস্থাপনার দুর্বলতারও নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। এখন সঠিক হিসাবের ব্যবস্থা রয়েছে, কম্পিউটারাইজড সিস্টেম রয়েছে। সব কিছু এখন নিয়মতান্ত্রিক। এখন এমন ভুল-ভ্রান্তি হওয়া উচিত নয়। সব দেশের সেক্রেটারী ওসীয়্যত এবং সেক্রেটারী মালের উচিত দেশের সকল সেক্রেটারী মাল এবং সেক্রেটারী ওসীয়্যতকে কর্মঠ করা বা সক্রিয় করা আর জামাতের আমীরদেরও কাজ হলো বিভিন্ন সময় এই বিষয়টি খতিয়ে দেখা। শুধু চাঁদা একত্রিত করা আর এরপর এর রিপোর্ট দেয়াই তাদের কাজ নয় বরং এই ব্যবস্থাপনাকে, এই সিস্টেমকে নির্ভরযোগ্য করে তোলা আর কেন্দ্র এবং স্থানীয় জামাতগুলোর মাঝে সুদৃঢ় যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত করা ও আমীরদের কাজ।

অনুরূপভাবে মুবাল্লেগীন এবং মুরব্বীদের প্রেক্ষাপটে ও আমি একটি কথা বলতে চাই, কোন কোন স্থানে জামাতের মুরব্বী এবং মুবাল্লিগদের রীতিমত মিটিং হয় না। মুবাল্লিগ ইনচার্জ রীতিমত মিটিং করার জন্য দায়ী হবেন। জামাতী, তরবিয়তী ও তবলিগী কাজেরও সঠিক চিত্র তাদের সামনে থাকা চাই। কেউ যদি ভাল কাজ করে তাহলে তার সম্পর্কে সেখানে মত বিনিময় হওয়া উচিত এবং সেই উন্নত কাজের জন্য যেই রীতি অবলম্বন করা হয়েছে তা থেকে যেন অন্যরাও উপকৃত হতে পারে সেই ব্যবস্থাও হাতে নেয়া উচিত। অনুরূপভাবে জামাতের সেক্রেটারীরা বিভিন্ন জামাতকে যে দিক-নির্দেশনা দেয় বা কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন জামাতকে যে দিক-নির্দেশনা পাঠানো হয় সে সম্পর্কেও রিপোর্ট দিন।

মুরব্বীদের এটিও দেখা উচিত যে, সব জামাতে এই প্রেক্ষাপটে কতটা কাজ হয়েছে। যেখানে সেক্রেটারীরা সক্রিয় নয় বা এ্যাক্টিভ নয় বিশেষ করে তবলীগ, তরবিয়ত এবং আর্থিক বিষয়ে সক্রিয় নয় সেখানে মুরব্বী/মুয়াল্লেমদের উচিত তাদের স্মরণ করানো। আল্লাহ্ তা'লা সমস্ত কর্মকর্তাদের তৌফিক দিন, আগামী তিন বছরের জন্য আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে খিদমতের যে সুযোগ করে দিয়েছেন সেই ক্ষেত্রে তারা যেন নিজেদের সকল শক্তি-সামর্থ্য ও যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে দায়িত্ব পালন করতে পারে, নিজেদের প্রতিটি কথা এবং কর্মের ক্ষেত্রে জামাতের জন্য তারা যেন অনুকরণীয় আদর্শ হতে পারে।

নামাযের পর আমি একটি গায়েবানা জানাযা পড়াব যা মোহতরমা সাহেবযাদী তাহেরা সিদ্দিকা সাহেবার যিনি মির্যা মুনীর আহমদ সাহেব-এর স্ত্রী ছিলেন। ২০১৬ সনের ১৩ জুলাই সন্ধ্যা ৬টায় তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।

তিনি হযরত নওয়াব আব্দুল্লাহ্ খান সাহেব এবং নওয়াব আমাতুল হাফিয বেগম সাহেবার ঘরে জন্ম গ্রহণ করেন, হযরত নওয়াব মোহাম্মদ আলী খান সাহেবের পৌত্রী এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দৌহিত্রী,আর হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব-এর পুত্র বধু ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে তিনি ওসীয়্যতকারিণী ছিলেন এবং ৯৫ বছর আয়ু লাভ করেন। তিনি কাদিয়ানে মেট্রিক পর্যন্ত প্রাথমিক পড়ালেখা করেন। হযরত আম্মাজান (রা.) তাকে কন্যা বানিয়ে রেখেছিলেন, বিশেষ স্নেহ এবং ভালবাসার সম্পর্ক ছিল তার সাথে। জেহলামে জনাব সাহেবযাদা মির্যা মুনীর আহমদ সাহেব-এর সাথেই ছিলেন। জেহলামে জনাব মুনীর আহমদ সাহেবের চিপ বোর্ড ফ্যাক্টরী ছিল যা কয়েক মাস পূর্বে জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। মরহুমা লাজনার প্রেসিডেন্ট হিসেবেও সেখানে কাজ করেছেন। ১৯৭৪ সালে যখন সেখানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয় তখন জেহলাম জামাতের বিরাট অংশ চিপ বোর্ড ফ্যাক্টরীতেই সমবেত হয়।

তিনি সেই যুগে জামাতের সদস্যদের খুব সুন্দর আতিথ্য করেন। তার এক কন্যা আমাতুল হাসীব বেগমের বিয়ে হয়েছে জনাব মির্যা আনাস আহমদ সাহেবের সাথে যিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর পুত্র, আরেক পুত্রের নাম হলো মির্যা নাসির আহমদ সাহেব যিনি জেহলামের আমীরও ছিলেন। ফ্যাক্টরীর ঘটনার পর তাকে জেহলাম ত্যাগ করতে হয়েছে। খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর জামাতা মির্যা সফির আহমদ সাহেব ও তার পুত্র। মরহুমা খুবই উন্নত স্বভাবের অধিকারিণী, হাসি-খুশী ও মিশুক প্রকৃতির ছিলেন। ধৈর্য্যশীলা, কৃতজ্ঞ, ইবাদতগুজার মহিলা ছিলেন। খিলাফতের সাথে সুগভীর সম্পর্ক ছিল। আর্থিক বিভিন্ন তাহরীকে উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অংশ নিতেন। আতিথেয়তার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল। জামাতের ব্যবস্থাপনা এবং জামাতের জন্য গভীর আত্মাভিমান রাখতেন। জামাতের ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে বা খিলাফতের বিরুদ্ধে কেউ কোন কথা বললে তাৎক্ষণিকভাবে তাকে বাঁধা দিতেন। আমি যেভাবে বলেছি হযরত আম্মাজান তাকে কন্যা হিসেবে অবলম্বন করেছিলেন। হযরত আম্মাজান নিজের বিয়ের এবং ব্যক্তিগত অনেক জিনিষ তাকে দিয়ে গেছেন যাতে হযরত আম্মাজানের নামও লিখা আছে। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার পদমর্যাদা উন্নীত করুন, তার প্রতি মাগফিরাত করুন, দয়াদ্র হোন, তার সন্তান-সন্ততিকেও তার পুণ্যের ওপর পরিচালিত হওয়ার তৌফিক দিন এবং সব সময় খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত ও সংশ্লিষ্ট রাখুন। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

ইযালা-এ-আওহাম

(সন্দেহ-সংশয় নিরসন)

প্রণয়ন ও প্রকাশনা ১৮৯১

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)

(২৪তম কিস্তি)

আরেকটি হাদীসও হযরত মসীহ্ ইবনে মরিয়মের মৃত্যুবরণ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে। সেটি হলো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করা হলো, কিয়ামত কবে হবে (বা কবে আসবে)? তিনি বললেন, 'আজকের তারিখ থেকে একশ' বছর পর্যন্ত সমস্ত মানবসন্তানদের ওপর কিয়ামত এসে যাবে।' এতে এ বিষয়ের দিকে ইশারা ছিল যে, সমসাময়িক মানুষদের মধ্যকার কোনো একজনও উল্লিখিত এই একশ' বছর কালের বেশী জীবিত থাকতে পারবে না। এ কারণেই অধিকাংশ উলামা ও সূফী-দরবেশগণও এ বিশ্বাসের দিকেই ধ্যান দিয়েছেন এবং নিজেরা এই মত পোষণ করেছেন যে, খিজারও মারা গেছেন (তিনিও জীবিত নেই)। কেননা পরম সত্যবাদী 'খাঁটি সংবাদদাতা' (নবী করীম) সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পবিত্র বাণীতে কোনো মিথ্যার অবকাশ বৈধ ও বিধেয় নয়। (উল্লেখ্য যে, হযরত ঈসার মতো হযরত খিজারও জীবিত আছেন বলে একটা অলীক বিশ্বাস প্রচলিত ছিল–উক্ত হাদীসের দরুন এর অবসান ঘটে– অনুবাদক)। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় যে আমাদের উলামা হযরত মসীহ্-ইবনে মরিয়মকে উল্লিখিত এই কিয়ামতেরও গন্ডির বাইরে রেখেছেন। অদ্ভূত ব্যাপার, বনি-ইসরাঈলের অন্যান্য নবীদের তুলনায় হযরত মসীহ্‌কে কেন বেশী মাহাত্ম্য দেয়া হয়?! দৃশ্যত এমনটি প্রতীয়মান হয় যে, বহু সংখ্যায় খ্রিষ্টানরা যখন ইসলামধর্মে প্রবেশ করে এবং হযরত মসীহ্ সম্পার্কিত কিছু কিছু শির্‌কপূর্ণ ধ্যান-ধারণা নিজেদের সঙ্গে বয়ে নিয়ে আসে তখন আমাদের মুসলমান ভ্রাতাগণ (তাদের সংস্পর্শের দরুন) হযরত ঈসাকে সেই সব অসঙ্গত মাহাত্ম্য দিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন, যা কুরআন করীম স্বীকার করে না। এই কারণে বিশেষত হযরত মসীহ্‌র প্রশংসার ক্ষেত্রে তাদের মাঝে সমীচীন মাত্রা ছাড়িয়ে বাড়াবাড়ির পর্যায় পরিলক্ষিত হয়। ন্যায় বিচার ও ন্যায়নীতির দৃষ্টিকোণ থেকে লক্ষ্যণীয় যে, বারাহীনে-আহমদীয়া গ্রন্থে খোদা তা'লা এ অধমকে (তাঁর ইলহামযোগে) হযরত আদম (আ.)-এর সদৃশ ও প্রতিচ্ছবি বলে আখ্যায়িত করেন। এর দরুন উলামার মাঝে কারও হৃদয়ে কোনো কষ্ট রেখাপাত করেনি। এরপর নূহ (আ.)-এর সদৃশ ও প্রতিচ্ছবি বলে আখ্যাত করেন, তাতেও কেউ দুঃখিত হন নি। এরপর ইউসুফ (আ.)-এর সদৃশ বলে আখ্যা দেওয়া হয়, তাতেও কোন মৌলভী সাহেব রেগে ওঠেন নি। এরপর হযরত দাউদের সদৃশ বলে আখ্যা দেয়া হয় তাতেও উলামার মাঝে কেউ রুষ্ট হননি। এরপর এ অধমকে হযরত মূসার সদৃশ বলেও আখ্যায়িত করা হয় তবুও ফকীহ্ ও মুহাদ্দিসদের মাঝে কেউ উত্তেজিত হন নি। এমন কি, এরপর আল্লাহ্ তা'লা এ অধমকে হযরত ইব্রাহীমের সদৃশ ও প্রতিচ্ছবি বলে আখ্যায়িত করেন তবুও কোনো ব্যক্তি একটুও রাগ বা উত্তেজেনা প্রকাশ করেন

চলমান টীকা : আর নবীগণ জীবিত অবস্থায় কবরে অবস্থান করেন– এ ধারণাটি সঠিক নয়। তবে কবরের সঙ্গে তাদের এক রকম সম্পর্ক অবশিষ্ট থাকে। আর এ কারণেই কাশ্‌ফ বা দিব্যদর্শন সূত্রে নিজ নিজ কবরে তাঁদের প্রত্যক্ষ করা যায় কিন্তু এমনটি নয় যে তাঁরা কবরে থাকেন তথা অবস্থান করেন বরং তাঁরা তো ফিরিশ্‌তাদের মতো বেহেশ্‌তের মাটিতুল্য আকাশসমূহে নিজ নিজ মর্যাদা অনুযায়ী (নির্ধারিত) মাকাম ও মার্গের অধিকারী হয়ে থাকেন। তাঁরা জাগ্রত অবস্থায় (দিব্যদর্শনে) পবিত্রচেতা লোকদের সাথে কখনও কখনও পৃথিবীতে এসে দেখা-সাক্ষাতও করে থাকেন। প্রায়শঃ আওলিয়াদের সাথে একেবারে জাগ্রত অবস্থায় আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের দেখা-সাক্ষাত সম্পর্কিত বৃত্তান্তে পুস্তকাদি পরিপূর্ণ রয়েছে এবং এ পুস্তকের প্রণেতাও কয়েকবার এ বিরল সৌভাগ্যে ভুষিত হয়েছে। 'আলহামদুলিল্লাহি আলা যালিকা' (আর এজন্য সব প্রশংসা আল্লাহ্‌রই)। বস্তুত নবী করীম (সা.)-এর এ হাদীসটিতে 'কবরে আমার অবস্থিতি চল্লিশ দিনের বেশি হতে পারে না'– এ বাক্যটি এ বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত বহন করে যে, প্রথম কয়েকদিন–যত পূত-পবিত্র মানুষই হোন না কেন কবরের সাথে এবং ইহজাগতিক ভূবনের সঙ্গে তাঁদের একটা বাড়তি সম্পর্ক যুক্ত থাকে– কারও বা দ্বীনি খিদমতের প্রবল পিপাসার কারণে এবং অন্য কারও-বা অপরাপর কারণ বশত:। তবে পরবর্তীতে সে-সম্পর্কটি এতো হ্রাস পায় যে ঐ সমাহিত ব্যক্তি যেন সে-কবরটি থেকে বেরিয়ে যান, (কবরটি সম্পূর্ণ ছেড়ে যান)। অন্যথায় রূহ বা আত্মা তো মৃত্যুর পরে পরে তৎক্ষণাৎই আকাশে তার আত্মিক মার্গে গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করে থাকে (–প্রণেতা)।

নি। এরপর সদৃশ সাব্যস্ত করার ধারা এ পর্যায়ে উপনীত হয় যে, (এ অধমকে) বার বার 'ইয়া আহমদ'-এর অভিধায় সম্বোধনপূর্বক আধ্যাত্মিক প্রতিবিম্বন প্রক্রিয়ায় সৈয়্যদুল-আম্বিয়া ও ইমামুল-আসফিয়া তথা নবীগণের সর্বশ্রেষ্ঠ ও পবিত্রদের সর্বাধিনায়ক হযরত মুকাদ্দস (পুত-পবিত্র) মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সদৃশ ও প্রতিচ্ছবি বলে আখ্যায়িত করেন তবুও আমাদের মুফাস্‌সির ও মুহাদ্দিসগণের উত্তেজনায় কোনো রেখাপাত করে নি।

এরপর যখন খোদা তা'লা এ অধমকে ঈসা বা ঈসার সদৃশ বলে আখ্যায়িত করলেন তখন ক্রোধ ও উত্তেজনায় সবার চেহারা রক্তিমবর্ণ ধারণ করলো এবং ভীষণ মাত্রায় উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে তাদের মধ্যকার কেউ এ অধমকে 'কাফির' সাব্যস্ত করলো, আর কেউ-বা এ অধমকে 'মুলহিদ' আখ্যা দিল। যেমন, 'লাখুকে' নিবাসী মৌলবী সাহেবের পুত্র মৌলবী আব্দুর রহমান সাহেব এ অধমের নাম 'মুলহিদ' রেখেছেন এবং যত্র-তত্র এ মন্তব্যও করেছেন যে, 'এ ব্যক্তি মুলহিদ কু-ধর্মাবলম্বী ও খারাপ এবং দেখা-সক্ষাতের অনুপযোগী। তাছাড়া এ লোকগুলো উত্তেজিতাবস্থায় এখানেই ক্ষান্ত হননি। বরং তারা খোদা তা'লার পক্ষ থেকেও এতদ্বিষয়ে (ইলহামমূলক) কোনো স্বর্গীয় সাক্ষ্য পাওয়ার জন্য অভিলাষী হন, যাতে তা তাদের পক্ষে আরও জুতসই সাব্যস্ত হতে পারে। অতএব তারা ক্রোধ ও ক্ষোভে পরিপূর্ণ হৃদয়ে 'ইস্তেখারা' (প্রার্থনা) করে। আর যেহেতু আদিকাল থেকে খোদা তা'লা কর্তৃক বলবৎ প্রাকৃতিক নিয়ম এটাই যে, নফসানি (কু-প্রবৃত্তিমূলক) কামনা-বাসনা নিয়ে কোনো ব্যক্তি যখন কোনো অদৃশ্যের সংবাদ উন্মোচিত হওয়ার জন্য অভিলাষী হয় তখন শয়তান তার সেই অভিলাষে অবশ্যই 'দখল দেয়' ও হস্তক্ষেপ করে থাকে। তবে নবী ও মুহাদ্দাস (ঐশীবাণী প্রাপক সিদ্ধপুরুষগণ)-এর বিষয় সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাদের প্রতি অবতীর্ণ ওহী-ইলহাম শয়তানের হস্তক্ষেপমুক্ত ও সর্বতঃপবিত্র অবস্থায় সংরক্ষণ করা হয়। অতএব এ করণেই স্বনামধন্য মৌলবি আব্দুর রহমান সাহেব ও তাঁর সম-নিয়্যতধারী মিঞা আব্দুল হক্ব গজনবীর ইস্তিখারার সময় পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত 'বি'সুল-ক্বারীণ' তথা অতি মন্দ সাথী (শয়তান) তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হয় এবং তাদের মুখ দিয়ে জারী করা হয় যে, এ ব্যক্তি তথা এ অধম কিনা জাহান্নামী ও মুলহিদ এবং এমন কাফির যে কখনও হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে না। আমি জিজ্ঞেস করি, উলামার পক্ষে এটাকি জায়েজ যে, কোনো এমন বিষয়ে তারা কুফরী ফতোয়া দেয়ার অধিকার রাখেন– যে বিষয়ে 'খায়রুল-ক্বরূন' (তথা ইসলামের সর্বোত্তম তিন শতাব্দী) এবং সাহাবা-কিরামের 'ইজমা' (সর্বসম্মত অভিমত) প্রমাণিত নয়, আর এ বিষয়ে এমন একজন 'মুলহাম' (ইল্‌হাম প্রাপ্ত) রয়েছেন, সম্ভাব্য পর্যায়ে যার সত্যতার সপক্ষে পবিত্র কুরআন ও কতিপয় হাদীস সাক্ষ্যস্বরূপ রয়েছে? অতএব বুঝতে সক্ষম এমন ব্যক্তি মাত্রই অনুধাবন করতে পারেন যে, প্রতিশ্রুত 'সদৃশ পুরুষ' হওয়ার সম্পর্কে এ অধমের প্রতি অবতীর্ণ ইলহাম হাদীস ও কুরআনের আদৌ পরিপন্থী নয় আর হাদীস-গ্রন্থাবলীকেও কখনও অকার্যকর সাব্যস্তকারী নয় এবং এগুলোর অর্থহীন ও নিষ্ক্রিয় হওয়ারও কারণ নয়। বরং এগুলোর সত্যায়নকারী ও এগুলোর সত্যতা আরও স্বচ্ছ ও জোরালোভাবে প্রকাশকারী বটে। অতএব এ কি সত্য নয় যে, 'সত্যাসত্য নির্ণয়কারী' মহাগ্রন্থ কুরআন করীম মরিয়মপুত্র হযরত ঈসা (আ.)-এর মারা যাওয়া সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করছে এবং স্বয়ং সহীহ্ মুসলিমের কতিপয় হাদীস প্রমাণ করছে যে প্রতিশ্রুত দাজ্জালও মৃত্যুবরণ করেছে? এমতাবস্থায় কুরআন করীম ও কতিপয় হাদীসের মাঝে সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে এছাড়া অন্য কী পথ খোলা রয়েছে যে, মরিয়মপুত্র হযরত মসীহ্‌র অবতীর্ণ হওয়া বলতে তাঁর একজন বা একাধিক সদৃশের আবির্ভাব বোঝায়? এরপর 'ইলহাম'ও যখন এদিকেই পথপ্রদর্শন করছে তখন তা কুরআন- হাদীস সম্মত বলে সাব্যস্ত হলো, না-কি বিরোধী সাব্যস্ত হলো?!

(চলবে)

ভাষান্তর : **মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ**
মুরব্বী সিলসিলাহ্ (অব.)

"সে ধর্ম ধর্ম নয়, যাতে সাধারণ সহানুভূতির শিক্ষা নেই এবং সে মানুষ মানুষ নয়, যার মধ্যে সহানুভূতির গুণ নেই। আমাদের খোদা কোন জাতির মধ্যে পার্থক্য করেন নি।...

অতএব আমাদের প্রভু-প্রতিপালকের এ সকল রীতি এ শিক্ষাই দিচ্ছে আমরাও যেন জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের প্রতি সৌজন্য ও সৌহার্দ্য দেখাই।"

[পয়গামে সুলেহ্ (শান্তির বার্তা) পুস্তক, পৃ. ৫]

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.)

বিশ্বশান্তি : সমকালীন সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান

হযরত মির্যা তাহের আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)

ধর্মীয় মূল্যবোধ অনাবশ্যক বলে বিবেচিত হচ্ছে

আজকের ধর্মীয় সামগ্রিক দৃশ্যপট পর্যবেক্ষণ করলে যে কেউ দেখতে পারেন যে, ধর্মের অভ্যন্তরে একটা পরস্পর-বিরোধী অবস্থা বিরাজ করছে। সধারণভাবে তো ধর্মের বাঁধন শিথীল হয়ে পড়ছে বটে, কিন্তু সাথে সাথে সেটাকে আবার অনেক ক্ষেত্রে শক্ত হতেও দেখা যাচ্ছে। সমাজের কোন কোন ক্ষেত্রে, প্রায় প্রতিটি ধর্মে এক প্রকার মধ্যযুগীয় গোঁড়ামি ও প্রতিপক্ষের প্রতি অসহিষ্ণু একটা মতাদর্শের তীব্র পশ্চাদমুখী আকর্ষণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

নৈতিকতার ক্ষেত্রে ধর্ম পিছিয়ে পড়ছে। অপরাধ অবাধে সংঘটিত হচ্ছে। সত্য দ্রুত অপসৃত হচ্ছে। সমতা এবং সুবিচার শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে। সমাজের প্রতি সামাজিক দায়িত্বাবলী উপেক্ষিত হচ্ছে। পক্ষান্তরে, একটা স্বার্থপর ব্যক্তি-কেন্দ্রিকতা শক্তি অর্জন করছে। এমনকি, তা শক্তিলাভ করছে পৃথিবীর সেই দেশগুলোতেও, যেগুলো, আর যাই হোক, নিজেদেরকে ধর্মীয় বলেই দাবী করছে। এগুলো এবং এর সঙ্গে আরও বহু সমাজিক খারাপি, যা কিনা নৈতিকভাবে অবক্ষয়প্রাপ্ত একটা সমাজের প্রকাশ্য লক্ষণ, তা আজ পরিণত হয়েছে একটা নিয়মে। যদি কোন ধর্মের নৈতিক মূল্যবোধগুলো সেই ধর্মের আত্মা এবং তার দেহ গঠন করে থাকে, তাহলে বলতে হবে যে, সেই সকল মূল্যবোধের ওপরে ক্রমাগত ক্রিয়াশীল একটা শ্বাসরোধ-প্রক্রিয়া চলছে, যা আমাদেরকে এই অপরিহার্য সিদ্ধান্তে উপনীত করে যে, যখন ধর্মের দৈহিক পুনরুত্থান ঘটানো হচ্ছে, ঠিক তখনই সেই দেহ থেকে আত্মার অতিদ্রুত নির্গমন ঘটছে। সুতরাং আজ আমরা ধর্মের মধ্যে যা প্রত্যক্ষ করছি তা হচ্ছে, ধর্মের ঐ তথাকথিত পুনরুজ্জীবনও যা, শবদেহের পুনরুত্থানও তা-ই, যা কিনা এদিক-সেদিক হাঁটতে থাকবে যাদুকরের মড়া চালান দেওয়ার মতই। অন্যান্য ক্ষেত্রে দীর্ঘ নিশ্চলাবস্থা এবং উৎসাহব্যঞ্জক উন্নতির অভাব সাধারণ ধার্মিক মানুষদের মধ্যে একঘেঁয়েমীর জন্ম দিয়েছে। তারা অলৌকিক ঘটনাবলী ঘটে যাওয়ার যে প্রত্যাশা রাখে তা-ও পূরণ হয় না। অতিপ্রাকৃতিক শক্তির হস্তেক্ষপে আজগুবী ঘটনাবলীর মাধ্যমে, তাদের মনোমত করে, দুনিয়াটাকে বদলিয়ে ফেলার জন্য জাগতিক ঘটনাবলীও সংঘটিত হয় না। তারা তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী রূপকাশ্রিত ভবিষ্যদ্বাণীগুলির পূর্ণতা দেখতে চায়, কিন্তু তেমন কিছুও ঘটে না। এরাই হচ্ছে সেইসব লোক যারা নতুন নতুন ধর্মমত সৃষ্টির উপাদান যোগায়, আর সেই উপাদান হচ্ছে তাদের হতাশার গলিত লাশ। অতীত থেকে নিষ্কৃতি লাভের বাসনা থেকেই সৃষ্টি হয় তাদের নতুন কিছু দিয়ে শূন্যতা পূরণের আকাঙ্খা।

এই সব ধ্বংসাত্মক প্রবণতা ছাড়াও, একটা চরম অসুবিধা সৃষ্টিকারী ব্যাপার যা, সম্ভবতঃ ধর্মীয় গোঁড়ামীর পুনরুত্থানের সঙ্গে সম্পৃক্ত, তা পৃথিবীর শান্তি নষ্ট করে ফেলছে। এই জাতীয় গোঁড়ামীর অভ্যুত্থানের দরুন একটা নেশাকর আবহাওয়ার সৃষ্টি হচ্ছে, যা আইডিয়া বা ধ্যান-ধারণার অবাধ আদান-প্রদান এবং আলাপ আলোচনার শুভ চেতনার মারাত্মক ক্ষতিসাধন করছে। যেন এতেও কিছুই হচ্ছে না। অসাধু রাজনীতিকদের স্বেচ্ছাচারিতা এই জাতীয় উত্তপ্ত আবহাওয়াকে নিজেদের স্বার্থেই কালিমালিপ্ত হয়ে পড়ছে। উপরন্তু, ঐতিহাসিকভাবে আন্তঃধর্মীয় বিবাদ বিসম্বাদ তো রয়েই গেছে। এছাড়াও তথাকথিত 'ফ্রি মিডিয়া' বা অবাধ ও নিরপেক্ষ গণ-মাধ্যমগুলি সাধারণভাবে মুক্ত থাকার পরিবর্তে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে অদৃশ্য হাতের দ্বারা। ফলে, সেগুলো বিশ্ব

পরিস্থিতির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে পারছে না। সুতরাং যখন কোন একটা দেশের গণ-মাধ্যম, সেই দেশের একই ধর্মাবলম্বী সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মুখপাত্র হিসেবে অপর একটা প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্মের নিন্দা-বিদ্বেষের লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়, তখন পরিস্থিতিটা আরও বেশি জটিল আকার ধারণ করে। তখন ধর্মই এই সব কলহ বিবাদের প্রথম শিকারে পরিণত হয়। ধর্মের জগতে আজ পৃথিবীতে যা ঘটছে তাতে আমি সত্যি সত্যিই উদ্বিগ্ন এবং ক্ষুব্ধ। ধর্মগুলির ক্ষেত্রে পরস্পরের মধ্য থেকে ভুল বুঝাবুঝি দূরীকরণের জন্য সত্যিকারের আন্তরিক উদ্যোগ গ্রহণের একটা গভীর আবশ্যকতা সৃষ্টি হয়েছে।

আমি বিশ্বাস করি যে, ইসলাম এরূপ সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য সহকারে সেই কল্যাণ সাধন করতে সক্ষম যাতে সম্পূর্ণরূপেই আমাদের সব চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা পূরণ হতে পারে।

বিষয়টিকে আমি ভালভাবে বোধগম্য করার জন্য কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছি।

যেমন, আমি বিশ্বাস করি যে, পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে ধর্মের জন্য যা বিশেষভাবে প্রয়োজন তা হচ্ছে ধর্মের দ্বারা সার্বজনীনভাবে সকল মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে, ধর্মকে ধর্মীয় সার্বজনীনতা স্বীকার করতে হবে, এবং তা এই অর্থে যে, সকল মানুষ ধর্ম, গোত্র ও ভৌগলিক-পরিচয় নির্বিশেষে একই স্রষ্টার সৃষ্টি। অতএব, তারা সকলেই ঐশী নির্দেশ লাভের সমান অধিকারী। অবশ্য, তেমন ঐশী নির্দেশ যদি তাদের কারো প্রতি, মানব সমাজের কোনও অংশের জন্য, কখনও দান করা হয়। এতে করে সত্যের ওপরে কোন ধর্মের একচেটিয়াকরণের যে ধারণা তা দূর হয়ে যাবে। সকল ধর্ম, সেগুলির নাম ও মতবাদ যাই হোক না কেন, সেগুলো যেখানেই পাওয়া যাক না কেন এবং যে যুগেরই হোক না কেন, সেগুলোর প্রত্যেকটির কিছু না কিছু ঐশী সত্যের অধিকারী হওয়ার দাবী করার অধিকার আছে। অধিকন্তু যে কাউকে স্বীকার করতে হবে যে, মতবাদ এবং শিক্ষা-দীক্ষার মধ্যে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, সব ধর্মই একটি অভিন্ন উৎস থেকে এসেছে। একই ঐশী কর্তৃত্ব বা অথরিটি, যা পৃথিবীর কোন এক এলাকার এক ধর্মের প্রবর্তন করেছে, তা পৃথিবীর অন্যান্য এলাকার এবং অন্যান্য যুগের মানুষদেরও ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজনেরও তত্ত্বাবধান করেছে। এবং, এটাই হচ্ছে প্রকৃত প্রস্তাবে ইসলামের পবিত্র গ্রন্থ কুরআন করীমের বাণী।

(হযরত মির্যা তাহের আহমদ রাহে. রচিত 'বিশ্বশান্তি ঃ সমকালীন সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান' পুস্তক-এর বাংলা সংস্করণ, পৃ: ১-৩)

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, যুক্তরাজ্য
৫০তম জলসা সালানা ২০১৬
স্থান ঃ হাদীকাতুল মাহ্‌দী হ্যাম্প শায়ার

অনুষ্ঠান সূচীর এক ঝলক

১২ আগষ্ট ২০১৬

জুমুআর খুতবা : বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬:০০

উদ্বোধনী অধিবেশন রোজ শুক্রবার শুরু- রাত ৯:২৫

* পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ
* উর্দু ও ফার্সী ভাষায় নযম

*** হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) প্রদত্ত উদ্বোধনী ভাষণ।**

১৩ আগষ্ট, ২০১৬ রোজ শনিবার

দ্বিতীয় অধিবেশন : বেলা ৩ : ০০ মি. থেকে শুরু

বক্তৃতা: * বয়আতের শর্তসমূহ প্রতিপালনে ব্যবহারিক নমুনার আবশ্যকতা– মি. বিলাল এ্যাটকিন্সন, রিজিওনাল আমীর, নর্থ-ইষ্ট, যুক্তরাজ্য।

* হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর জীবনে মহানবী (সা.) এর মহান সুন্নত অনুসরণের উজ্জল দৃষ্টান্ত– মোহতরম মওলানা মুবাশ্বের আহমদ কাহলুন, মুফতি সিলসিলা আলীয়া আহমদীয়া, রাবওয়া।

* আহমদীয়া খিলাফত'-এর শতবর্ষ পূর্তিতে কৃত অঙ্গীকার প্রতিপালনে আমাদের দায়বদ্ধতা – মওলানা সৈয়্যদ মুবাশ্বের আহমদ আইয়ায, প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া রাবওয়া।

*** মহিলা জলসাগাহে হুযূর (আই.)-এর শুভাগমন ও লাজনাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদান বিকাল ৫ টা।**

তৃতীয় অধিবেশন : বাংলাদেশ সময় রাত ৮:৪৫ থেকে শুরু

* বিশিষ্ট অতিথি বৃন্দের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য

*** হুযূর (আই.) এর ভাষণ**

চতুর্থ অধিবেশন (১৪ আগষ্ট ২০১৬) ৩:০০ থেকে শুরু

বক্তৃতা: * একটি মিথ্যা আপত্তি সন্ত্রাসের পক্ষে কুরআন-এর অপনোদনে– ডা. ইজায-উর রহমান, সদর, মজলিস আনসারুল্লাহ, ইউকে।

* আহমদী শহীদদের ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলী– ডা. আব্দুল খালিক খালিদ, সদর, মজলিস আনসারুল্লাহ, পাকিস্তান।

* আমাদের খোদা চিরঞ্জীব খোদা –মওলানা আতাউল মুজিব রাশেদ, মিশনারী ইনচার্জ, ইউকে, ইমাম ফযল মসজিদ, লন্ডন।

* অমুসলিমদের সাথে মহানবী (সা.)-এর উত্তম আচার ব্যবহার– রফিক আহমদ হায়াত, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ইউকে।

আন্তর্জাতিক বয়আত অনুষ্ঠান। বিকাল ৬:০০

সমাপ্তি অধিবেশন রাত ৮:০০ থেকে শুরু

* আমন্ত্রিত বিশেষ অতিথি বৃন্দের সংক্ষিপ্ত শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান।
* শিক্ষাক্ষেত্রে সাফল্যের জন্য পুরস্কার বিতরণ।
* আহমদীয়া শান্তি পুরস্কারের ঘোষণা ।

*** হুযূর (আই.)-এর সমাপনী ভাষণ।**

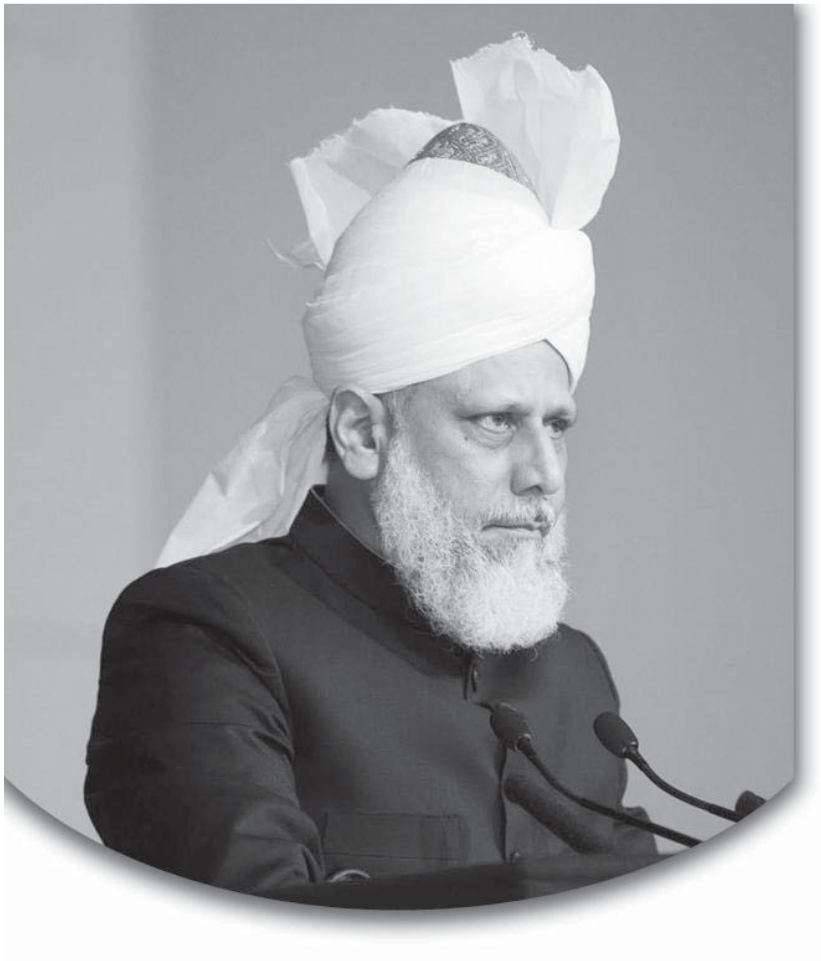

জুমুআর খুতবা

ইসলামে জুমুআর গুরুত্ব

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১ জুলাই, ২০১৬ তারিখের জুমুআর খুতবা

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআন থেকে নিম্নোক্ত আয়াত সমূহ পাঠ করে বলেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۭ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

وَاِذَا رَاَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوَا ِۨانْفَضُّوْٓا اِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَاۗىِٕمًا ۭ قُلْ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۭ وَاللّٰهُ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ۝ ع

(সূরা আল্-জুমুআ: ১০-১২)

আল্লাহ্ তা'লা রমযানের রোযার আবশ্যকতার কথা যেখানে বলেছেন সেখানে একই সাথে এই কথাও বলেছেন যে, 'আইয়্যামাম মা'দুদাত' (সূরা আল্-বাকারা: ১৮৫) অর্থাৎ সীমিত কয়েকটি দিন। রমযানের সূচনাতে আমাদের অনেকেই হয়তো ভেবে থাকবে যে, এখন গ্রীষ্মকালীন দীর্ঘ দিন আর এর মাঝে এই ত্রিশটি রোযা কিভাবে অতিবাহিত হবে, অনেক কষ্ট হবে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা যেভাবে বলেছেন যে, হাতে গোনা কয়েকটি দিন, এই দিনগুলোও কেটে গেছে।

আজকে ২৫তম রোযা। অনেকেই আমাকে লিখে যে, এই দিনগুলো কেটে গেল, আর জানতেও পারলাম না। এটি সত্য কথা যে, যখন রমযান আরম্ভ হয়, প্রথম দিকে মনে হয় দিন অনেক দীর্ঘ, কিন্তু এই দিনগুলো যখন অতিবাহিত হওয়া আরম্ভ হয় তখন মানুষ বুঝতেই পারে না। আজকে রমযানের শেষ জুমুআ। আর মাত্র পাঁচটি রোযা বাকি আছে বা কোন কোন স্থানে চারটি। এই চার-পাঁচ দিনেও আমাদের সবার চেষ্টা করা উচিত, রমযান থেকে লাভবান হওয়ার ক্ষেত্রে যদি কোন ঘাটতি

থেকে যায় তাহলে এই দিনগুলোতে তা দূরীভূত করার চেষ্টা করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লার কাছে সবার দোয়া করা উচিত, খোদা তা'লা যেন আমাদের সবার দুর্বলতা ঢেকে রাখেন, আমাদের প্রতি কৃপা পরবশ হন এবং আমাদেরকে যেন রমযানের কল্যাণরাজি থেকে বঞ্চিত না রাখেন। আমি যেভাবে বলেছি, আজকে রমযানের শেষ জুমুআ। সাধারণ পরিভাষায় একে 'জুমুআতুল বিদা' বলা হয়।

সাধারণ মুসলমানরা এই জুমুআকে রমযানের শেষ জুমুআ মনে করে আর এই ধারণা করে যে, এই জুমুআয় সব দোয়া গৃহিত হয় আর এই জুমুআ পড়ার মাধ্যমে যেন সারা বছরের জন্য ছুটি লাভ হয়ে গেল। এই জুমুআয় শামিল হলে নামায, জুমুআ এবং সকল প্রকার ইবাদতের দায়িত্ব পালিত হয়ে যায়। কিন্তু একজন প্রকৃত মু'মিনের দৃষ্টিভঙ্গী বা ধারণা এমন নয়। এটি খুবই ভ্রান্ত একটি ধারণা। একজন আহমদী বরং সত্যিকার মু'মিনের দৃষ্টিতে এমন কথা বার্তা বা এমন ধ্যান ধারণা ধর্মের সাথে হাসি ঠাট্টার নামান্তর। আমাদের ওপর খোদা তা'লার অনেক বড় অনুগ্রহ যে, তিনি এই যুগে খোদার প্রেরীত এবং তাঁর রসূল মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান ও নিবেদিত প্রাণ দাস হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে গ্রহণ করার তৌফিক আমাদেরকে দিয়েছেন। যিনি আমাদেরকে এসব ভ্রান্ত ধারণা এবং চিন্তাধারা থেকে মুক্ত করে সত্যিকার পথ দেখিয়েছেন আর ইসলামের সত্যিকার শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করেছেন এবং খোদার নৈকট্য লাভের পথ দেখিয়েছেন। একবার এক বৈঠকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছে প্রশ্ন রাখা হয় যে, মুসলমানদের মাঝে প্রচলন হল, জুমুআতুল বিদার দিন মানুষ চার রাকাত নামায পড়ে আর এর নাম রাখে 'কাযায়ে উমরী', আর এই নামাযের পেছনে উদ্দেশ্য হয়ে থাকে অতীতে যেসব নামায মানুষ পড়ে নি তা যেন পূরণ হয়। এর কোন প্রমাণ আছে কি না বা এটি বৈধ কি না? এই নামাযের আসল বাস্তবতা কি?

এটি শুনে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন যে, এটি একটি বৃথা এবং বাজে বিষয়। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি জেনে শুনে সারা বছর এই মানসে নামায ছেড়ে দেয় যে, কাযায়ে উমরীর দিন সেই নামায পড়ে নেব এমন ব্যক্তি পাপাচারী, কিন্তু যে ব্যক্তি অনুশোচনার সাথে তওবা করে আর এই মানসে পড়ে যে, ভবিষ্যতে নামায ছাড়ব না, সে পড়লে কোন অসুবিধা নেই। তিনি বলেন, এই বিষয়ে আমরা হযরত আলী (রা.)-এর উত্তরই প্রদান করে থাকি।

হযরত আলী (রা.)-এর উত্তর সংক্রান্ত ঘটনা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এভাবে বর্ণনা করেন যে, একবার এক ব্যক্তি অসময়ে নামায পড়ছিল, তখন নামাযের সময় ছিল না। কেউ হযরত আলী (রা.)-কে বলে যে, আপনি খলীফায়ে ওয়াক্ত, একে বারণ করেন না কেন, এ তো অসময়ে নামায পড়ছে। তিনি বলেন, আমার আশঙ্কা হয় যে, কোথাও এই আয়াত অনুসারে দোষী না সাব্যস্ত হই যে,

أَرَءَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ ⑩
عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ ⑪

(সূরা আল্-আলাক: ১০-১১)

অর্থাৎ তুমি কি সেই ব্যক্তি সম্পর্কে চিন্তা করেছ যে, এক বান্দাকে নামায নামায পড়তে বাধা দেয়। এরপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, যদি অনুশোচনা স্বরূপ, হারানো জিনিষ কুড়ানোর চেষ্টায় রত হয় তাহলে পড়তে দাও, কেন বারণ কর। সে তো কেবল দোয়াই করে অর্থাৎ এই চার রাকাত পড়ে আসলে তো দোয়াই করে। তবে হ্যাঁ এটি অবশ্যই হীন বলের পরিচয়, এতে নিয়্যতের চিত্র আল্লাহ্ তা'লা ভাল করেই জানেন। হযরত আলী (রা.) যে কারণে সাবধানতা অবলম্বন করেছেন এবং কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'লা যে বলেছেন,

أَرَءَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ ⑩
عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ ⑪

(সূরা আল্-আলাক: ১০-১১)

এই আয়াতদ্বয়কে সামনে রেখে তাকে বাধা দেন নি, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ও একই বিষয়কে সামনে রেখে এই ফতোয়া দিয়েছেন। কিন্তু একই সাথে তিনি (আ.) এটিও স্পষ্ট করেছেন যে, এটি অবশ্যই হীন বলের পরিচায়ক। যদি 'কাযায়ে উমরী'-ই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে আর সংশোধন যদি উদ্দেশ্য না হয় তাহলে তা সঠিক নয়। কিন্তু যদি কেউ এই উদ্দেশ্যে পড়ে যে, আজকে চার রাকাত পড়ছি এরপর রীতিমত নামায পড়ব, আমি তওবা করছি, তাহলে ঠিক আছে। যদি উদ্দেশ্য সংশোধন না হয় তাহলে এমন ব্যক্তি পাপিষ্ঠ।

সুতরাং জামাতে আহমদীয়ায় কাযায়ে উমরীর কোন ধারণাই নেই। আমরা যুগ ইমামকে মেনেছি আর এই শর্ত স্বাপেক্ষে মেনেছি যে, বিদাত বর্জন করব, ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দিব। আর যেখানে আমরা ধর্মকে প্রাধান্য দেয়ার এই অঙ্গীকার করেছি সেখানে নামায কিভাবে ছাড়া যেতে পারে আর জুমুআ কিভাবে পরিত্যাগ করা যেতে পারে। আমাদের জন্য যদি কোন জুমুআতুল বিদার ধারণা থেকে থাকে তাহলে সেই ধারণা সম্পূর্ণ ভিন্ন। একজন সত্যিকার আহমদীর জুমুআতুল বিদার ধারণা এটি হওয়া উচিত যে, আমরা বেদনা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে এই জুমুআকে বিদায় দিচ্ছি, আর এই চিন্তা এবং এই দোয়ার সাথে বিদায় দিচ্ছি যে, সত্যিকার অর্থে জুমুআকে নয় বরং এই মাসকে আর এই বরকতময় দিনগুলোকে বিদায় দিচ্ছি।

জুমুআ যেহেতু বড় সংখ্যায় আমাদের একত্রিত হওয়ার মাধ্যম হয়েছে আর এটি রমযানে শেষ জুমুআ তাই আমরা সবাই সমবেত হয়ে খোদা তা'লার সন্নিধানে এই দোয়া করি যে, হে আল্লাহ্! আমাদের তৌফিক দাও যেন আবার, অর্থাৎ যেই দিন এবং যেই জুমুআ আমরা এই রমযানে অতিবাহিত করেছি আর যেই কল্যাণরাজি আমরা এই রমযানে অর্জন করেছি তার ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে নিজের সকল শক্তি সামর্থ্য নিয়ে আমরা যেন আগামী রমযানকে স্বাগত জানাই।

এটিই আমাদের চিন্তা চেতনা হওয়া উচিত। কোন প্রিয়জনকে এইজন্য বিদায় দেয়া হয় না যে, যাও এখন তুমি বিদায় নিচ্ছ তাই এখন আমরা তোমাকে ভুলতে যাচ্ছি। এখন তোমাকে মনে করা নিয়ে আমাদের কোন মাথাব্যাথা নেই। নিজের প্রিয়জন, যারা স্থায়ীভাবে ছেড়ে যায় মানুষ তাদের স্মরণ থেকেও বিরত থাকতে পারে না, তাদের স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য তাদের নেক কর্মকে ধরে রাখে বা তাদের নামে বিভিন্ন পুণ্য কর্মের সূচনা করে। কেউ যদি মু'মিন হয় তাহলে তাদের জন্য দোয়াও করে। আর যারা সাময়িকভাবে বিদায় নেয়, নিজের ব্যস্ততা এবং কাজের কারণে এক

শহর থেকে অন্য শহরে বা এক দেশ থেকে অন্য দেশে স্থানান্তরিত হয় এমন মানুষকে তো মানুষ আদৌ ভুলে না। আর আধুনিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে তারা ফোনে বা ট্যাক্সট মেসেজে বা বিভিন্নভাবে বার্তা আদান প্রদানের যে মাধ্যম রয়েছে সেই সবের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করে। বরং আজকাল তো স্কাইপ আরম্ভ হয়েছে, স্কাইপের মাধ্যমে প্রিয়জনের আওয়াজ এবং তাদের গতিবিধিও লক্ষ্য করা যায়।

সুতরাং কোন প্রিয়জনকে আমরা এই জন্য বিদায় দেই না যে, এখন এক বছর বা দু'বছরের জন্য তুমি আমাদের মন থেকে বেরিয়ে যাবে, আমরা তোমাকে ভুলে যাব, ভুলে যাব যে, তুমি কে আর কি ছিলে। পুনরায় যখন দেখা হবে তখন দেখা যাবে যে, তোমাদের অধিকার প্রদান করব কি না, তোমার সাথে কোন ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ করা যাবে কি না। প্রশ্ন হলো, জাগতিক সম্পর্কের গন্ডিতে কেউ এমনটি ঘটতে দেখেছে কি? কেউ যদি এমনটি করে তাহলে তাকে সবাই উন্মাদ বা পাগলই বলবে। কিন্তু যখন সেই সত্তার প্রশ্ন আসে যিনি সবচেয়ে প্রিয়, যিনি বিশ্বপ্রতিপালক, যিনি আমাদের লালন পালনকারী, যিনি সবকিছুর দাতা, যিনি রহমান এবং রহীম, যিনি পরিশ্রমের ফল দিয়ে থাকেন, যিনি বলেন যে, আমার সত্তায় ঈমানকে পরম মার্গে পৌঁছাও, যিনি বলেন, আমার সাথে প্রেম এবং ভালোবাসার বন্ধনকে ছিন্ন করো না, যিনি বলেন, আমার কথা মান কেননা সব প্রিয়জনের চেয়ে বেশি আমি তোমাদের ভালোবাসি এবং আমিই ভালোবাসার যোগ্য পাত্র, যিনি বলেন যে, আমার স্মরণকে সতেজ রাখ, তাকে যদি আমরা বলি যে, হে আল্লাহ্! তোমার বড়ই মেহেরবানী। তুমি তোমার স্মরণ, তোমার ইবাদত আর রোযার হাতে গোনা দিনগুলোর মধ্য দিয়ে আমাদের অতিবাহিত করেছ। এখন আমাদের ছুটি, আমাদের সব কাজ শেষ। কোন্ প্রভু আর কোন্ আল্লাহ্‌র কথা বলছো।

এই জুমুআয় আমরা তোমাকে বিদায় দিচ্ছি। আর এই বিদায়ের মাধ্যমে পুরো এক বছরের জন্য তোমাকে ভুলতে যাচ্ছি বা ভুলাতে যাচ্ছি। এক বছর পর যখন আগামী রমযান আসবে তখন পুনরায় ইবাদত এবং নেক কর্মের মাধ্যমে আমরা তোমাকে স্মরণ করার চেষ্টা করব। জীবন এবং স্বাস্থ্য যদি বিশ্বস্ততা করে তাহলে তোমার অধিকার যতটা সম্ভব আদায় করার চেষ্টা করব। পুরো রমযানে কোন ইবাদত এবং নেক কর্ম করতে না পারলেও রমযানের শেষের দিকে জুমুআতুল বিদা তো আসবেই। তাতে একত্রিত হয়ে তোমার প্রাপ্য অধিকার প্রদান করব। তোমার রোবুবিয়্যত বা প্রতিপালন এবং তোমার ইহসান তথা অনুগ্রহরাজির প্রতিদান দিব। কোন ব্যক্তি যদি এমন মন মানসিকতা রাখে এবং এমন মনোভাব ব্যক্ত করে তাহলে মানুষ তাকে পাগলই বলবে। কিন্তু মানুষ এমন চিন্তা ধারাই হৃদয়ে লালন করে। মুখে না বললেও কার্যত তা-ই প্রকাশ পায়। পরবর্তী জুমুআর উপস্থিতি দেখেই তা অনুমান করা যায়। যদি পরিস্থিতি এমনই হয় তাহলে একে অজ্ঞতা নাম দেয়া হবে বা বলা হবে যে, ধর্মের ওপর বিন্দুমাত্র এবং আল্লাহ্‌র ওপর আদৌ কোন ঈমান নেই।

সুতরাং এটি এক মু'মিনের চিন্তা ধারা হতে পারে না। মু'মিন এসব ধ্যান ধারণার বহু ঊর্ধ্বে। মু'মিন খোদার নির্দেশিত পুণ্যকে জীবিত রাখে, সে খোদার কৃতজ্ঞতার প্রেরণায় সমৃদ্ধ থাকে, সে খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টায় রমযান অতিবাহিত করে। খোদার নির্দেশ শিরোধার্য করে সে যখন রমযানকে বিদায় দেয় তখন বেদনা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলে যে, এখন আমরা রমযান অতিক্রম করছি ঠিকই কিন্তু এই দিনগুলোর স্মৃতি সবসময় হৃদয়ে জাগ্রত এবং জাগরুক থাকবে। রমযানে যে সমস্ত সুন্দর এবং নেক বিষয়াদি শিখেছি সেগুলোর পুনরাবৃত্তি এবং জুগালী করব। রমযানে ইবাদতের প্রতি যে মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে সেটিকে স্থায়ী রূপ দেব। তোমার নৈকট্য লাভের সফরে আমাদের অগ্রযাত্রা কখনো থেমে যাবে না। আমরা তোমার স্নেহ এবং ভালোবাসার আশ্চর্যজনক সব দৃশ্য দেখেছি। আমরা হেঁটে যখন তোমার কাছে যাওয়ার চেষ্টা করি তুমি স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে ছুটে আমাদের কাছে আস।

তাই এটি কিভাবে সম্ভব হতে পারে যে, আমরা আমাদের জাগতিক আত্মীয়তার স্মৃতিকে জাগ্রত রাখব, কিন্তু যিনি সবচেয়ে বেশি প্রিয়, সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন তাঁকে ভুলে যাব এবং তাঁর অনুগ্রহরাজিকে ভুলে যাব। খোদার অনুগ্রহ প্রদর্শনের রীতিও বড় অভিনব। এটি কত বড় অনুগ্রহ যে, তিনি এই বিদায়ের পর স্মৃতি ধরে রাখার জন্য, সেগুলোকে ভুলা এবং বিস্মৃত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য, প্রিয় এবং আকর্ষনীয় স্মৃতিকে পুনরাবৃত্তি ও যুগালীর জন্য সাত দিন পর সেই অনুষ্ঠানের উপকরণ সৃষ্টি করেছেন যার মধ্য দিয়ে আমরা জুমুআতুল বিদার দিন অতিবাহিত হয়েছি বা হই। নিঃসন্দেহে রমযানের অপেক্ষার জন্য বছর নির্ধারিত করেছেন কিন্তু তাঁর স্নেহের বহিঃপ্রকাশ এবং তাঁর নিয়ামরাজি থেকে বঞ্চিত রাখেন নি। প্রত্যেক সপ্তম দিন জুমুআ রেখে আমাদেরকে সেসব কল্যাণরাজিতে সিক্ত করেছেন যা জুমুআতুল বিদার দিন আমরা লাভ করেছিলাম বা লাভ করার ছিল।

মহানবী (সা.) বলেছেন, জুমুআর দিন এমন একটি মুহূর্ত আসে যাতে এক মুসলমান যখন দাঁড়িয়ে নামায পড়ে তখন সে যে দোয়াই করে সেই অবস্থায় তা গৃহীত হয় কিন্তু সেই মুহূর্ত খুবই সংক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। এই মুহূর্ত বা এই সময় এবং এই ক্ষণ সাধারণ জুমুআর দিনও ততটাই দীর্ঘ হয় যতটা রমযানের শেষ জুমুআয় হয়ে থাকে। অতএব আজকের পর আমরা আল্লাহ্ তা'লার এই নৈকট্যের ক্ষণ এবং মুহূর্ত থেকে পৃথক বা বিচ্ছিন্ন হচ্ছি না বরং সাত দিন পর এই সময় পুনরায় আমাদের লাভ হতে যাচ্ছে। এই সকল নেক কর্ম এবং এই সকল মুহূর্ত এবং ক্ষণকে যদি কেউ বিদায় দেয় তাহলে সে মু'মিন নয়। মু'মিন কখনো নেকী বা পুণ্যকে বিদায় দিতে পারে না।

মু'মিন আল্লাহ্‌কে ছেড়ে কখনো দূরে যায় না বা যেতে পারে না। বরং সে সবসময় নেকীকে বা পুণ্যকে জাগ্রত ও জাগরুক রাখার উপরকণ সন্ধান করে, কিভাবে খোদার নৈকট্য লাভ করা যায় সেই রীতি সন্ধান করে। খোদার নৈকট্য লাভের উপায় বা ওসীলা বা পন্থাও সীমিত নয়। প্রতিটি পুণ্য খোদা পর্যন্ত পৌঁছায়। মানুষ তাই সেই সমস্ত পথ সন্ধানের চেষ্টা করে। শুধু জুমুআর ওপরই নির্ভর করে না যে, জুমুআ আসলে খোদার সাথে সাক্ষাতের উপকরণ সৃষ্টি হবে, বরং মহানবী (সা.) স্বল্পতম সময়ে খোদার সাথে সাক্ষাত এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের রীতি বোঝাতে গিয়ে বলেছেন, পাঁচ বেলার নামায, এক জুমুআ পরবর্তী জুমুআ পর্যন্ত এবং এক রমযান পরবর্তী রমযান পর্যন্ত এর মধ্যবর্তী সময়ে যে সমস্ত পাপ সাধিত হয় তার কাফ্‌ফারা

বা প্রাশ্চিত্য হয়ে যায়। তবে শর্ত হলো মানুষ যদি বড় বড় পাপ এড়িয়ে চলে।

সুতরাং খোদা তা'লার নৈকট্য লাভের জন্য দৈনিক পাঁচ বেলা যোগাযোগের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। অর্থাৎ এই সব নামাযের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার সাথে যোগাযোগ রাখ, তাহলে খোদার ক্ষমা থেকে অংশ পাবে, তাঁর করুণা ভাজন হবে। তবে হ্যাঁ শর্ত হলো জেনেশুনে ধৃষ্টতার সাথে যদি বড় পাপে লিপ্ত না হও। প্রত্যেক জুমুআয় অংশ গ্রহণ কর আর সেই বিশেষ মুহূর্তকে লুফে নাও যা দোয়া গৃহিত হওয়ার মুহূর্ত। তাহলে তোমরা পাপ মুক্ত থাকবে এবং পুণ্যের ক্ষেত্রে অগ্রগামী হবে। রমযানে অর্জিত পরিবর্তনকে সারা বছর ধরে রাখ আর পাপে লিপ্ত হয়ো না। তাহলে শুধু রমযান মাসই নয় বরং সারা বছর তোমরা খোদার রহমত এবং তাঁর ক্ষমাভাজন হবে আর অগ্নি থেকে মুক্তি লাভ করবে। অতএব আজকে সবার এই অঙ্গীকার করা উচিত যে, এই জুমুআ এবং এই রমযান আমাদের জন্য নামাযের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষনকারী রমযান হবে, জুমুআ আদায়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষনকারী হবে। আর যে সমস্ত পুণ্য কর্ম রমযানে আমরা করেছি এবং শিখেছি পরবর্তী রমযান পর্যন্ত সেগুলোকে ধরে রাখার আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা করব।

সুতরাং ইবাদত এবং পুণ্যের প্রতি রমযানে আমাদের যে মনোযোগ নিবদ্ধ হয়েছে তার ওপর স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকার আমরা অঙ্গীকার করব যেন পরবর্তী রমযানের প্রস্তুতি ও পরবর্তী রমযানকে স্বাগত জানানোর জন্য আমাদের রিহার্সেল এবং প্রশিক্ষণ অব্যাহত থাকে। যেন পরবর্তী রমযানে প্রবেশের সময় আমাদের একটি গন্তব্য অতিক্রান্ত হয়ে যায়। আর সফল হওয়ার জন্য নতুন লক্ষ্য এবং নতুন টার্গেট যেন আমরা নির্ধারণ করি। আর পুণ্যের ক্ষেত্রে যেন আমরা এগিয়ে যেতে পারি। আর আরো অধিক যেন খোদার নিকটতর হই, তাঁর সত্তার যেন অধিক জ্ঞান ও বুৎপত্তি আমাদের অর্জন হয়।

আমাদের অনেকেই এমন আছে যারা খোদার নৈকট্যের অনেক মাইল ফলক অতিক্রম করেছেন কিন্তু আমরা এই দাবি করতে পারব না যে, আমরা সকল মাইল ফলক অতিক্রম করেছি। এইসব ফলক অতিক্রমের জন্য যদি আমরা কেবল রমযানেরই অপেক্ষায় থাকি তাহলে সারা জীবন কেটে যাবে আর আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আর গন্তব্যে হয়তো আমরা পৌঁছতে পারব না। সারা জীবন কেটে গেলেও এক বছরের কর্মশূন্যতা আমাদেরকে পুনরায় সেখানে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে যেখানে আমরা প্রথম দিন দাঁড়িয়ে ছিলাম। এই রমযানে আমি যেসব খুতবা দিয়েছি তাতে তাকওয়া, দোয়া, আল্লাহ্ তা'লার আদেশ-নিষেধ মেনে চলা যার মাঝে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ হলো ইবাদতের নির্দেশ, যা আমাদের জীবনের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য, অনুরূপভাবে পারস্পরিক অধিকার প্রদানের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করা, উন্নত নৈতিক চরিত্র ও নৈতিক গুণাবলীর ধারক-বাহক হওয়া সংক্রান্ত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত ছিল।

প্রত্যেক খুতবার পর আমার কাছে অনেকেরই পত্র আসতো যে, আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বিভিন্ন উদ্ধৃতির বরাতে আমরা এসব বিষয় ভালোভাবে বোঝার তৌফিক পেয়েছি। ঠিক আছে, বোঝার তৌফিক লাভ হয়েছে, কিন্তু এসব কথা লাভজনক হবে যদি এগুলোকে জীবনের স্থায়ী অংশ করে নেয়ার চেষ্টা করা হয়। আমি হাদীসের বরাতে যেভাবে বলেছি যে, প্রতিটি জুমুআরই গুরুত্ব রয়েছে। জুমুআর গুরুত্ব রমযানের জুমুআর সাথেও সম্পর্কযুক্ত নয় আর জুমুআতুল বিদার সাথেও সম্পর্কযুক্ত নয় বরং জুমুআর গুরুত্ব স্থায়ীভাবে জুমুআ পড়ার প্রতি আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকার মাঝেই নিহিত। আর পাঁচবেলার নামাযের প্রতিও যেন আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ থাকে। রমযান আমাদেরকে এই কথা বলতে এসেছে যে, সমষ্টিগতভাবে নামায, পুণ্য এবং জুমুআ পড়ার যে আগ্রহ এবং সচেতনতা জন্ম নিয়েছে এটিকে মরতে দিবে না আর পরবর্তী রমযান পর্যন্ত এর হিফাযত কর, এর রক্ষাণাবেক্ষণ কর। আমি যে আয়াতগুলো তিলাওয়াত করেছি, তাতেও আল্লাহ্ তা'লা জুমুআর গুরুত্ব সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই আয়াতগুলোর অনুবাদ হলো,

'হে যারা ঈমান এনেছ! জুমুআর দিনের একটি বিশেষ অংশে যখন তোমাদের নামাযের জন্য ডাকা হয় তখন আল্লাহ্‌কে স্মরণ করতে দ্রুত এগিয়ে আস আর ব্যবসা-বাণিজ্য পরিত্যাগ কর। এটি তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা বুঝতে।

পরবর্তী আয়াত হলো, 'আর নামায শেষ হয়ে গেলে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং খোদার ফযল বা অনুগ্রহ অন্বেষণ কর আর অজস্র ধারায় আল্লাহ্ তা'লাকে স্মরণ কর যেন তোমরা সাফল্য লাভ করতে পার।' এরপর শেষ আয়াত যা সূরা জুমুআরও শেষ আয়াত বটে, তা হলো, 'আর যখন তারা কোন ব্যবসা-বাণিজ্য বা আমোদ-প্রমোদ দেখে বা দেখবে তখন তার প্রতি ছুটে যাবে আর তোমাকে একা পরিত্যাগ করবে। তুমি বল, যা কিছু আল্লাহ্‌র কাছে আছে তা আমোদ-প্রমোদ এবং ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে অধিক উত্তম। আর আল্লাহ্ জীবিকাদাতাদের মাঝে সর্বোত্তম।'

সুতরাং এখানে বিশেষ করে জুমুআয় যোগদানের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে। জুমুআর আযানের আওয়াজ যখন শোন বা আজকাল সবাই জানে, ঘড়ি আছে, সময় নির্ধারিত থাকে, ঘড়ি দেখ। জুমুআর সময় যদি হয়ে যায় তাহলে নিজের সকল কাজকর্ম ও ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ কর আর জুমুআর জন্য এসে যাও। জুমুআর খুতবাও নামাযেরই অংশ। তাই আলস্য প্রদর্শন করো না যে, নামায শুরু হওয়া পর্যন্ত পৌঁছেই যাব এবং নামাযে যোগ দেব, বরং খুতবার জন্য পৌঁছার চেষ্টা করা উচিত। এখানে আমি কথা প্রসঙ্গে এটিও বলতে চাই বরং এটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কথা যে, এ যুগে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এমটিএ-এর সুযোগ বা নিয়ামত দান করেছেন। ইউরোপ এবং আফ্রিকার কোন কোন দেশে জুমুআর সময় একই।

তাই সময় যেহেতু এক তাই খলীফায়ে ওয়াক্তের খুতবা শোনা উচিত। এটি আমাদের ওপর খোদা তা'লার অনেক বড় অনুগ্রহ যে, তিনি এই সুযোগ এবং এই নিয়ামতের মাধ্যমে জামাতকে ঐক্যবদ্ধ করার আরো একটি ব্যবস্থা করেছেন। যেখানে সময়ের পার্থক্য আছে সেখানেও আহমদীদের খুতবা শোনা উচিত, লাইভ না হলে রেকর্ডিং শোনা উচিত। আর এভাবে খুতবার বিভিন্ন উদ্ধৃতি নিয়ে যারা খুতবা দেয় বা যেখানে মুরব্বী-মুবাল্লিগগণ খুতবা দিয়ে থাকেন তাদের স্ব স্ব জামাতে জুমুআর

দিন বা পরবর্তী জুমুআর দিন এই খুতবা পড়ে শোনানো উচিত। আর যতই পশ্চিমে যাবেন সেখানে প্রভাত বা ফযরের সময় হয়ে থাকে তারা সে দিনও শোনাতে পারে এই খুতবা। পূর্বে বা প্রাচ্যে দিন যেহেতু শেষ হয়ে যায়, খুতবা সন্ধ্যার সময় হয়ে থাকে বা সন্ধ্যা পার হয়ে যায় তাই তারা পরবর্তী জুমুআর দিন শোনাতে পারে। এটি জামাতের মাঝে ঐক্য সৃষ্টির অনেক বড় একটি মাধ্যম। বরং জুমুআর সাথে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগের যে একটা বিশেষ সম্পর্ক আছে খোদা তা'লা এই আবিষ্কারের মাধ্যমে খলীফায়ে ওয়াক্তের খুতবাকে এর একটি অংশে পরিণত করেছেন।

দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা স্পষ্ট করেছেন যে, যদি তোমাদের কাজ থাকে তাহলে জুমুআর পূর্বে বা পরেও তা করতে পার। জুমুআর সময় বিশেষভাবে কাজ ছেড়ে দিয়ে যদি জুমুআর জন্য আস তাহলে জাগতিক কাজকর্মের ক্ষেত্রেও তোমরা খোদার ফযল এবং কৃপার উত্তরাধিকারী হবে। তাই জুমুআয় এ জন্য অংশগ্রহণ না করা যে, আমাদের জাগতিক কার্যকলাপ এতে প্রভাবিত হবে, এমন ধারণা শুধু ভ্রান্তই নয় বরং মানুষের নিজের জন্য তা ক্ষতিকর। কোন কাজের ফল দেয়া বা কাজকে ফলবাহী করা এবং তাতে বরকত সৃষ্টি করা আল্লাহ্‌র হাতে। তাই স্মরণ রেখ, যদি খোদার কথা না মান, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন যে, তাহলে তোমার কাজে কোন বরকত এবং কল্যাণ থাকবে না। যদি কথা মান এবং গ্রহণ কর তাহলে তোমার কাজ আশীষ মন্ডিত হবে। এরপর আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, জাগতিক কার্যকলাপ এবং ক্রীড়া কৌতুক যেন জুমুআর পথে বাঁধ না সাধে, বিশেষ করে এ যুগে আমরা এই বিষয়গুলো দেখতে পাই।

আমি যেভাবে বলেছি যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগের সাথে এ যুগের বিশেষ সামঞ্জস্য রয়েছে, তাই বিশেষভাবে এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য এখন আর কেবল স্থানীয়ই নয়, প্রথমে বা পূর্বে ব্যবসা-বাণিজ্য স্থানীয় হত, বিভিন্ন অঞ্চলে বাণিজ্য কাফেলাও যেত কিন্তু তারা জিনিসপত্র এনে শুধু একটি শহরেই বিক্রি করত। আর এখন ব্যবসা-বাণিজ্যের স্থানীয় রূপ হারিয়ে গেছে, বরং আন্তর্জাতিক রূপ নেয়ার কারণে তা তোমাদের বেশি ব্যস্ত রাখে। অনুরূপভাবে তোমাদের ক্রীড়া কৌতুক ও জাগতিক ব্যস্ততা আন্তর্জাতিক রূপ নেয়ার কারণে সময়ের সীমার আর কোন চেতনা থাকে না। এমন পরিস্থিতিতে তোমাদের বা একজন মু'মিনের অবশ্যই জুমুআর গুরুত্বের বিষয়ে সচেতন হওয়া উচিত, কেননা একজন মু'মিনের কাছে সবচেয়ে অগ্রগণ্য বিষয় হলো খোদার সন্তুষ্টি অর্জন করা। আর এটিই এক মু'মিনের জন্য প্রিফারেন্স বা অগ্রগণ্য বিষয় হওয়া উচিত। মহানবী (সা.)-এর সাহাবীরা তাঁর পবিত্র আধ্যাত্মিক শক্তির কল্যাণে শত ভাগ পবিত্র ছিলেন, খোদার সন্তুষ্টি তাঁদের কাছে সবচেয়ে অগ্রগণ্য ছিল।

তাই তাঁদের ক্ষেত্রে তো ভাবাই যেতে পারে না যে, তারা ব্যবসা-বাণিজ্য বা ক্রীড়া কৌতুক ও আমোদ-প্রমোদের জন্য জুমুআ পরিত্যাগ করে থাকবেন। আর স্থানীয় ভাবে তো জুমুআর দৃষ্টিকোণ থেকে অন্যান্য কার্যক্রমকে এ্যাডজাষ্ট বা সমন্বয় করা সম্ভব হত। এটি নিশ্চিতরূপে আমাদের যুগের চিত্র, আর মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগের চিত্রই অংকন করা হয়েছে যখন ধর্মকে অগ্রগণ্য করার বিষয়টি হবে গৌণ আর জাগতিক কার্যকলাপ হবে মূখ্য। মানুষ ২৪ ঘন্টা ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রীড়া-কৌতুকে ব্যস্ত থাকবে, দূরত্ব কমে যাবে, প্রচার মাধ্যমের সুবাদে ঘরে বসেই পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের আমোদ-প্রমোদ এবং ক্রীড়া-কৌতুকের বিষয়াদি নাগালের ভিতর পাবে।

আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এমন সময় যদি তোমরা তোমাদের প্রিফারেন্স বা অগ্রগণ্য বিষয় সঠিক রাখ তাহলে স্মরণ রেখ যে, তোমরা খোদার অনুগ্রহ ও কৃপাভাজন হবে। নিশ্চয় খোদার কাছে যা আছে তা ক্রীড়া-কৌতুক এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের উপকরণ থেকে সমধিক উত্তম এবং আল্লাহ্ তা'লা সকল প্রকার রিয্‌কও দান করেন। তাঁর পক্ষ থেকেই সকল প্রকার রিয্‌ক এসে থাকে, তিনি রাযেক বা জীবন জীবিকার উত্তম ব্যবস্থাকারী। সুতরাং তাঁর কথা শিরোধার্য করে যদি জুমুআর হিফাযত বা রক্ষণাবেক্ষণ কর তাহলে জাগতিক জীবন জীবিকার ক্ষেত্রেও তোমরা বরকতের ভাগী হবে।

তাই জুমুআর এই গুরুত্ব আমাদেরকে সামনে রাখতে হবে। আমরা যারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মান্যকারী আমাদের কোন অর্থেই সাজে না যে, আমরা আমাদের জুমুআ পড়াকে শুধু রমযান পর্যন্ত বা জুমুআতুল বিদা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করব। জুমুআর গুরুত্ব আরো স্পষ্ট করার জন্য আমি আরো কয়েকটি হাদীস উপস্থাপন করছি। রসূলে করীম (সা.) জুমুআর গুরুত্ব এবং কল্যাণের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে এক জায়গায় বলেন যে, জুমুআর দিন মসজিদের সব দরজায় ফিরিশতা দাঁড়িয়ে যায়, তারা মসজিদে প্রথমে প্রবেশকারীর নাম প্রথমে লিখে আর এভাবে ক্রমাগতভাবে আগমনকারীদের তালিকা প্রস্তুত করে, এমনকি যখন ইমাম খুতবা দিয়ে বসে যান তখন ফিরিশতারাও তাদের রেজিষ্টার বা খাতা বন্ধ করে দেয়।

অতএব যারা জাগতিক কার্যকলাপের অজুহাতে শেষের দিকে আসে এই তালিকায় তারা শেষের দিকেই যুক্ত হয়। আর যারা শেষের দিকে আসে তারা খুব কমই পুণ্য লাভ করে। হাদীসে আছে যারা শেষে আসে তারা মুরগীর ডিমের সমান পুণ্য লাভ করে আর যারা প্রথমে আসে তারা উটের সমান পুণ্যের ভাগী হয়। এসব দৃষ্টান্ত এ কথা স্পষ্ট করার জন্য বলা হয়েছে যে, তোমরা যখন মসজিদে এসে বস আর কিছু সময় সেখানে কাটাও, তখন এটি মনে কর না যে, সময় নষ্ট হল বরং এই রীতি এমন ব্যক্তিকে পুণ্যের ভাগী করে এবং যারা প্রথমে আসে তাদেরকে পরে আগমনকারীদের ওপর স্বতন্ত্র মর্যাদা দিচ্ছে। যারা প্রথমে আসে তারা মসজিদে বসে আল্লাহ্‌র স্মরণে রত থাকে, এটি অবশ্যই খোদার নৈকট্যের কারণ হয়ে থাকে। এর গুরুত্ব মহানবী (সা.) একবার এভাবে স্পষ্ট করেছেন যে, মানুষ কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তা'লার দরবারে জুমুআয় আসার দৃষ্টিকোণ থেকে উপবিষ্ট থাকবে, অর্থাৎ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ। বর্ণনাকারী এটিও বলেছেন যে, চতুর্থ ব্যক্তিও খোদার সন্নিধানে বসার দৃষ্টিকোণ থেকে খুব বেশি দূরে থাকবে না।

আরেকবার মহানবী (সা.) বলেন যে, জুমুআর নামাযে এসো আর ইমামের কাছে বস। এক ব্যক্তি জুমুআয় পিছিয়ে থাকতে থাকতে জান্নাত থেকেও পিছিয়ে যায়, অথচ সে জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্যতা রাখে।

সুতরাং এসব হাদীস থেকে স্পষ্ট হয় যে, জুমুআর নামাযের অসাধারণ গুরুত্ব রয়েছে, তা সেই জুমুআ রমযানে আসুক বা রমযানের শেষ জুমুআ হোক বা বছরের সাধারণ সময়ের জুমুআই হোক না কেন। জান্নাত থেকে পিছিয়ে থাকার অর্থ হলো মানুষ নিজের আলস্য এবং জুমুআকে গুরুত্ব না দেয়ার কারণে অন্যান্য গুণাবলী থাকা সত্ত্বেও নিজেকে জান্নাত থেকে বঞ্চিত করে বা খোদা থেকে নিজেকে বহু দূরে ঠেলে দেয়। তার কাছে জুমুআর গুরুত্ব না থাকার কারণে জুমুআ ছেড়ে দেয়া আরম্ভ করে। এ সম্পর্কে মহানবী (সা.) এক জায়গায় এভাবে সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তি একের পর এক তিনটি জুমুআ কোন কারণ ছাড়া ছেড়ে দেয় খোদা তা'লা তার হৃদয়ে মোহর মেরে দেন।

অতএব যারা জুমুআয় অংশগ্রহণকে হালকা দৃষ্টিতে দেখে থাকে তাদের জন্য গভীর সতর্ক বাণী রয়েছে। হৃদয়ে মোহর মেরে দেয়ার অর্থই হলো তারা এরপর পুণ্যের কোন তৌফিক পায় না আর খোদার স্নেহভাজনও হয় না। সুতরাং প্রতিটি হাদীস থেকে এটি স্পষ্ট যে, প্রতিটি জুমুআই গুরুত্বপূর্ণ আর আমাদের পুরো সচেতনতার সাথে চেষ্টার মাধ্যমে জুমুআয় অংশগ্রহণ করা উচিত। কিন্তু কিছু মানুষ এমনও আছে যারা বাধ্য, যারা জুমুআয় আসতে পারে না, অনেককে আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং ছাড় দিয়েছেন। আল্লহ্ তা'লা অবিবেচক নন।

এমন মানুষ যারা ব্যতিক্রম জুমুআয় আসার ক্ষেত্রে তাদের সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেছেন যে, কৃতদাস, নারী, শিশু এবং রুগ্নরা সকলেই এমন লোকদের অন্তর্ভুক্ত যারা জুমুআয় আসতে পারে না বা পারবে না। তাদের জন্য জুমুআয় না আসার ছাড় বা ব্যতিক্রম রয়েছে। এখানে কথা স্পষ্ট হয়ে গেল, কোন কোন মহিলা জিজ্ঞেস করেন এবং পত্র লিখেন বরং অনেকেই অভিযোগ, অনুযোগ করেন যে, অনেক সময় ব্যবস্থাপকরা আমাদেরকে বলেন যে, জুমুআয় শিশুদের হৈচৈ বা হট্টগোল হয়ে থাকে, তাই যাদের শিশু আছে তারা যেন জুমুআয় না আসে। এসব নারী এবং শিশুদের স্বয়ং রসূলে করীম (সা.) ব্যতিক্রম আখ্যায়িত করেছেন। তাই যেখানে শিশুদের পৃথক বসানোর ব্যবস্থা নেই সেখানে এমন মায়েদের আসা উচিত নয়। এমনিতেও জুমুআয় আসা নারীদের জন্য আবশ্যক নয়। কিন্তু পুরুষের জন্য জুমুআ আবশ্যক। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কেও একবার মহিলাদের জুমুআ পড়া সংক্রান্ত প্রশ্ন করা হয়েছে। তিনি বলেন, যা সুন্নত এবং হাদীস থেকে প্রমাণিত এর বেশি আমরা আর কি তফসীর করতে পারি।

রসূলে করীম (সা.) যেখানে নারীদের ব্যতিক্রম আখ্যায়ীত করেছেন সেখানে নির্দেশ কেবল পুরুষদের জন্যই, অর্থাৎ জুমুআর নির্দেশ পুরুষদের জন্যই, পুরুষদের জন্য জুমুআ আবশ্যক, যদি তারা অসুস্থ না হয়, কোন বৈধ বাধ্যবাধকতা না থাকে তাহলে জুমুআয় অবশ্যই আসতে হবে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) জুমুআর গুরুত্ব সম্পর্কে বা এই গুরুত্বের প্রেক্ষাপটে ১৮৯৫-৯৬ এ ভারতে জুমুআ পড়ার জন্য দুই ঘন্টা ছুটির উদ্দেশ্যে সরকারী অফিসে স্মারক পত্র প্রেরণের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন এবং মুসলমানদের কাছ থেকে দস্তখত নেয়া আরম্ভ করেন। তখন মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন একটি বিজ্ঞাপন প্রচার করেন যে, এই কাজ তো ভাল কিন্তু মির্যা সাহেবের এই কাজ করা উচিত নয়, আমরা নিজেরাই এই কাজ করব।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন যে, জশ এবং খ্যাতির সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই, আপনি বা আপনারা নিজেই করুন। এরপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সেই কাজ থেকে সরে আসেন। কিন্তু মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন সাহেব এবং অন্য কোন মুসলমানও এরপর এ বিষয়ে আর কোন কাজের তৌফিক পায় নি এবং এই কাজ আর হয়নি। যাহোক একবার ভারতের ভাইসরয় লর্ড কার্জনকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) একটি স্মারকলিপি প্রেরণ করেন যাতে তিনি (আ.) তার বিভিন্ন গুণাবলীর উল্লেখ করে আর মুসলমানদের অধিকার প্রদানের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন যে, লাহোরের শাহী মসজিদ তিনি মুসলমানদের হাতে প্রত্যার্পণ করেছেন। অনুরূপভাবে আরো একটি মসজিদ যা রেলওয়ের নিয়ন্ত্রণে ছিল তাও উদ্ধার করে মুসলমানদেরকে দিয়েছেন আর অনেক বড় অনুগ্রহ করেছেন। এই স্মারকলিপিতে তিনি আরো লিখেন যে, মুসলমানদের একটি বাসনা এখনো পূর্ণ হওয়া বাকী আছে আর আশা রাখি যে, যার হাতে এই লক্ষ্য পূর্ণ হয়েছে অর্থাৎ মসজিদ ফিরে পেয়েছি সেই বাসনাও তার মাধ্যমেই পূর্ণ হবে, আর সেই বাসনা হলো জুমুআর দিন।

জুমুআর দিনটি একটি মহান ইসলামিক অনুষ্ঠান। কুরআনে করীম বিশেষভাবে এটিকে ছুটির দিন আখ্যা দিয়েছে। এ সম্পর্কে কুরআনে একটি বিশেষ সূরা রয়েছে যার নাম হলো সূরা জুমুআ। এতে নির্দেশ রয়েছে যে, জুমুআর দিন যখন আযান দেয়া হয় তখন সব জাগতিক কার্যকলাপ বন্ধ করে মসজিদে সমবেত হও আর সমস্ত শর্ত স্বাপেক্ষে জুমুআর নামায পড়, যে ব্যক্তি এমনটি করবে না সে অনেক বড় পাপী আর তার ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। জুমুআর নামায এবং খুতবা শোনার প্রতি কুরআনে যতটা তাকিদ রয়েছে ততটা তাকিদ ঈদের নামাযের জন্যও করা হয় নি। এই কারণে শুরু থেকে বা সূচনা থেকেই যখন থেকে ইসলামের অভ্যুদয় ঘটেছে তখন থেকেই মুসলমানদের মাঝে জুমুআর দিন ছুটি চলে আসছে। আর এদেশেও প্রায় আটশত বছর পর্যন্ত যতদিন এদেশে ইসলামের রাজত্ব ছিল জুমুআর দিন ছুটি দেয়া হত। এটি এক দীর্ঘ স্মারকলিপি ছিল, তিনি এতে বলেন, এদেশে তিনটি জাতির বসবাস, হিন্দু, খ্রিষ্টান এবং মুসলমান। হিন্দু এবং খ্রিষ্টানদেরকে তাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের দিন সরকার ছুটি দিয়ে রেখেছে অর্থাৎ রোববার, যেদিন তারা তাদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করে, সচরাচর এই দিন ছুটি হয়ে থাকে। কিন্তু তৃতীয় শ্রেণী অর্থাৎ মুসলমানরা তাদের ধর্মীয় উৎসব অর্থাৎ জুমুআর দিন থেকে বঞ্চিত। তিনি আরো বলেন যে, এই সরকার মুসলমানদের ওপর যেইসব অনুগ্রহ করেছে সেই তালিকায় যদি এই এহসানও অন্তর্ভুক্ত হয় অর্থাৎ জুমুআর দিন যদি গণ ছুটি দেয়া হয় তাহলে এটি স্বর্ণালী অক্ষরে লেখার যোগ্য হবে।

এই ছিল মুসলমানদের জন্য এবং ইসলামী শিক্ষা অনুসরণ আর ইবাদতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের সচেতনতা। সরকার যদি এই বরকতময় দিনে মুসলমানদের ছুটি দেয় বা যদি সম্ভব না হয় তাহলে অর্ধ দিবসও ছুটি দেয় তাহলে আমি মনে করি না যে, সাধারণ মানুষকে সন্তুষ্ট করার জন্য এর চেয়ে বড় কোন কাজ হতে পারে।

আজ নামধারী আলেম বা মুসলমানরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করে যে, তিনি

ইংরেজদের রোপিত বৃক্ষ অথচ মুসলমানদের ধর্মীয় অধিকারের প্রতি যদি কেউ ইংরেজদের মনোযোগ আকর্ষণ করে থাকে তাহলে মসীহ্ মাওউদ (আ.) ই তা করেছেন, অন্য কোন মুসলমান নেতা সেই তৌফিক পায়নি। এটি তাঁরই কাজ ছিল কেননা এ যুগ যাতে পৃথিবীর সামনে ইসলামের গুরুত্ব স্পষ্ট করা এবং এর প্রকৃত শিক্ষা অনুসরণ করানোর কাজ এবং দায়িত্ব তাঁরই ওপর ন্যাস্ত ছিল, তাঁর ওপরই খোদা এই দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন। সুতরাং আমরা যারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে মানার দাবি করি আমাদের প্রতিটি কথা এবং কর্মে ইসলামী শিক্ষার প্রকৃত চিত্র ফুটে উঠা উচিত।

আমাদের অঙ্গীকার করা উচিত যে, এই রমযান যে সব বরকতরাজি নিয়ে এসেছে এবং যেই কল্যাণরাজি ছেড়ে যাচ্ছে সেটিকে আমাদের জীবনের স্থায়ী অংশে এবং অঙ্গে পরিণত করতে হবে, ইনশাআল্লাহ। শুধু একমাসের জন্য ইসলামী শিক্ষার ব্যবহারিক চিত্র হলে আমাদের চলবে না বরং যুগ ইমামের সাথে কৃত অঙ্গীকারকে স্থায়ীভাবে রক্ষা করে যেতে হবে। এটি মসীহ্ মওউদের যুগ, আর জুমুআর প্রেক্ষাপটে এর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। আর আমাদের দায়িত্ব কি সেই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যা বলেছেন এ সংক্রান্ত দু'একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরছি,

এক জায়গায় তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লা যে নিয়ামতকে পূর্ণতা দিয়েছেন সেই নিয়ামত হলো এই ধর্ম যার নাম তিনি ইসলাম রেখেছেন আর জুমুআর দিনও নিয়ামতের অন্তর্গত যেদিন এই নিয়ামত পূর্ণতা লাভ করেছে। এটি এদিকে ইঙ্গিত যে, নেয়ামতের পূর্ণতার যে কথা রয়েছে অর্থাৎ

لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ

(সূরা আস্-সাফ: ১০) রূপে যেই নেয়ামত পূর্ণতা লাভ করবে সেটিও এক অসাধারণ জুমুআ হবে আর সেই জুমুআ এখন এসে গেছে। কেননা আল্লাহ্ তা'লা সেই জুমুআকে মসীহ্ মওউদের সাথে সম্পৃক্ত রেখেছেন, সেটি মসীহ্ মাওউদেরই বিশেষত্ব।

পুনরায় এ দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বলেন যে, এটি এক উৎসব যা আল্লাহ্ তা'লা সৌভাগ্যবানদের জন্য নির্ধারণ করেছেন। আর কল্যাণ মণ্ডিত তারা যারা এটিকে লুফে নেয়। তোমরা যারা আমার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছ, আদৌ গর্ব করো না যে, তোমাদের যা পাওয়ার ছিল তা তোমরা পেয়ে গেছ। এটি সত্য কথা যে, তোমরা সেই সকল অস্বীকারকারীদের সাথে তুলনার নিরীখে সৌভাগ্যবান যারা ভয়াবহ অস্বীকার এবং অবমাননার মাধ্যমে খোদাকে অসন্তুষ্ট করেছে আর এটি সত্য যে, তোমরা ভাল ধারণা পোষণ করে আল্লাহ্ তা'লার ক্রোধ থেকে নিজেদের বাঁচানোর ব্যাপারে সচেষ্ট হয়েছ। কিন্তু সত্য কথা হলো তোমরা সেই প্রস্রবণের কাছে পৌঁছে গেছ যা আল্লাহ্ তা'লা এখন চীরস্থায়ী জীবনের জন্য সৃষ্টি করেছেন। হ্যাঁ, এখনও পানি পান করা বাকী আছে। সুতরাং খোদার ফযল এবং বদান্যতায় সেই তৌফিক যাচনা কর যেন তিনি তোমাদের পরিতৃপ্ত করেন। কেননা আল্লাহ্ ছাড়া কিছুই হওয়া সম্ভব নয়। আমি নিশ্চিতভাবে জানি, যে এই প্রস্রবণ থেকে পান করবে সে ধ্বংস হবে না, কেননা এই পানি প্রাণপ্রদ আর ধ্বংস থেকে রক্ষা করে এবং শয়তানের আক্রমণ প্রতিহত করে। এটি থেকে পরিতৃপ্ত হওয়ার উপায় হলো আল্লাহ্ তা'লা যে দু'টি দায়িত্ব তোমাদের ওপর ন্যস্ত করেছেন সেগুলো পুরোপুরি প্রদান কর। একটি হলো খোদার প্রাপ্য প্রদান করা আর অপরটি হলো সৃষ্টির প্রাপ্য প্রদান করা।

সুতরাং চলুন আমাদের সকলেই আজ এই অঙ্গীকার করি যে, আমরা আমাদের বয়আতের যেই অঙ্গীকার তা রক্ষা করব। আর খোদা ও তাঁর সৃষ্টির প্রাপ্য সেভাবে প্রদানের চেষ্টা করব, যেভাবে এক মু'মিনের কাছে প্রত্যাশা রাখা হয় আর যেভাবে খোদা তা'লা নির্দেশ দিয়েছেন এবং আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যার কথা উল্লেখ করেছেন। রমযানের কল্যাণরাজিকে আমরা স্থায়ীভাবে আমাদের জীবনের অংশ করে নিব, ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে সেই তৌফিক দান করুন। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনূদিত।

মূসায়ী মসীহ্ এবং মুহাম্মদী মসীহ্ এক ব্যক্তি নন, দুই স্বতন্ত্র ব্যক্তি

মহানবী (সা.) স্পষ্টভাবে বলেছেন, 'প্রতিশ্রুত মাহ্দী (আ.) আগমনকারী ঈসা ইবনে মরিয়ম ছাড়া অন্য কেউ নন।'

[ইবনে মাজা, বাব শিদ্দাতুয্ যামান]

উপরোক্ত হাদীস স্পষ্ট বলছে, প্রতিশ্রুত ঈসা পূর্বের ঈসা নন বরং ইমাম মাহ্দীরই একটি পরিচয় হল, তিনি রূপক অর্থে ঈসা ইবনে মরিয়ম। বুখারী শরীফেও উভয় মসীহ্ (আ.)-এর পৃথক পৃথক দৈহিক গড়ন বর্ণিত হয়েছে। একজনের গায়ের রং লাল-ফর্সা; অপরজনের গায়ের রং গধুম বর্ণ। একজনের মাথার চুল কোঁকড়ানো; অপরজনের মাথার চুল সরল-সোজা। অতএব পূর্বের ঈসা (আ.) এবং শেষ যুগে আগমনকারী ঈসা (আ.) দু'জন আলাদা ব্যক্তি।

[বুখারী, কিতাবুল আম্বিয়া]

খোদা কোন ধর্মাবলম্বীকেই তাঁর বান্দাদের প্রতি জুলুম করার শিক্ষা দিতে পারেন না।

ধর্মের নামে জগতে জুলুম অনুষ্ঠিত হয় সত্য, কিন্তু এটা ধর্মহীন লোকদের কাজ।

বল প্রয়োগ করা হয় খোদার নামে, কিন্তু খোদা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ লোকেরাই এরূপ কাজ করে থাকে।

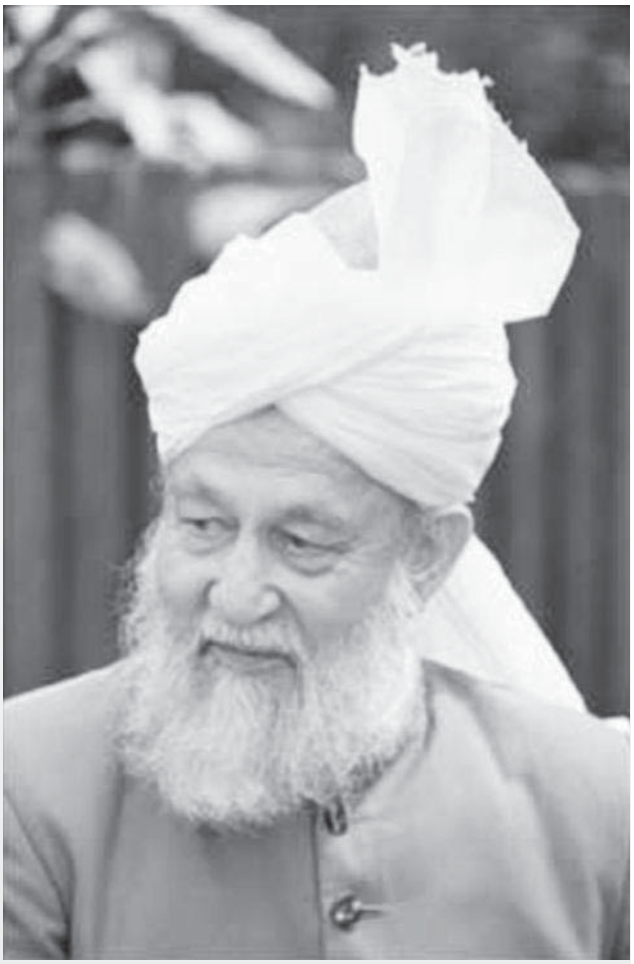

ধর্মের নামে রক্তপাত

হযরত মির্যা তাহের আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)

মানবজাতির ইতিহাস রক্ত ও কর্দমে মলিন। কাবিল যে দিন হাবিলকে হত্যা করেছিল, সেই দিন হতে আজ পর্যন্ত অন্যায়ভাবে এত রক্তপাত করা হয়েছে যে, ঐসব রক্ত একত্রে জমা করলে পৃথিবীর বুকে এখন যত মানুষ বাস করে, তাদের সকলেরই পোশাক তা দিয়ে রঞ্জিত হয়ে আরও বহু রক্ত অবশিষ্ট থেকে যাবে। এমনকি আমাদের ভবিষ্যদ্বংশধরগণের পরিচ্ছদও তা দিয়ে রঞ্জিত করা সম্ভবপর হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তবুও আজ মানুষের রক্ত পিপাসার নিবৃত্তি হলো না।

কাবিলের হাতে হাবিলের প্রাণনাশের কথা আমাদের শিক্ষার্থে কুরআন ও বাইবেলে আজও সংরক্ষিত আছে। এটাই প্রথম অন্যায় খুন। পৃথিবী লয় না হওয়া পর্যন্ত যতদিন একটি মানুষও পৃথিবীতে জীবিত থাকবে, ততদিন এই কাহিনী ধরাপৃষ্ঠে সজীব থাকবে। কিন্তু মানুষ যখন তার অতীত ইতিহাসের প্রতি নজর করে এবং সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান জগতের অবস্থা ও তার পারিপার্শ্বিকতার প্রতি লক্ষ্য করে, তখন যে ছবি তার নয়ন পথে ভেসে উঠে, তা ভর্ৎসনার রূপ ধরে তার হৃদয়ে কাঁটার ন্যায় বিঁধতে থাকে। সে দেখে মানুষ পূর্বেও জালেম ছিল এবং এখনও সে জালেম। পূর্বেও সে অত্যাচারী ছিল এখনও সে অত্যাচারীই রয়েছে। তার রক্তপাতের ইতিবৃত্ত বড়ই দীর্ঘ। এর অন্ত নাই। কাবিলের মধ্যে যে রক্ত পিপাসা জ্বলে উঠেছিল, আজও তা অগণিত হৃদয়ে জ্বলছে। সহস্র সহস্র বর্ষ ব্যাপী এই আগুন জ্বলতে থাকা সত্ত্বেও এর প্রশমন হয়নি।

একদিকে যেমন ব্যক্তি-হত্যার দৃষ্টান্তের পরিসীমা নেই, অপর দিকে তেমনি ব্যাপক গণহত্যা, যা জাতি জাতির বিরুদ্ধে সাধন করেছে, তার দৃষ্টান্তেরও কোন সীমা পরিসীমা নাই। সমুদ্রের অন্তহীন উর্মীমালার ন্যায় পৃথিবীর এক স্থানের অধিবাসীর ওপর ঝেঁপে পড়েছে। মৃত্যুর ধ্বজা উড়িয়ে দলে দলে ধ্বংসকারী বাহিনী নতুন নতুন দেশ বিজয়ের জন্য বের হয়েছে। রোমান সম্রাট

রক্তের নদী প্রবাহিত করেছে এবং পারস্য সম্রাটও রক্তের নদী বইয়েছেন। মহাবীর আলেকজান্ডার ও নীরুর হাতও রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল। হালাকু ও চেঙ্গিসের হাতে বাগদাদের যে ধ্বংসলীলা সাধিত হয়েছিল, তা আজও ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলোকে কলঙ্কিত করে রেখেছে।

এসব খুন কখনও সম্মান ও খ্যাতি লাভের নামে করা হয়েছে, আবার কখনও হিংসা, বিদ্বেষ ও শত্রুতার কারণে করা হয়েছে। কখনও জীবিকা অর্জনের জন্য বের হয়ে বুভুক্ষ জাতিসমূহ এ সমস্ত অত্যাচার করেছে এবং কখনও শুধু বিশ্ব বিজয়ের উদ্দেশ্যে যথেচ্ছাচারী নৃপতিগণ অগণিত হত্যাকাণ্ড করেছেন। পুনরায় এটিও বহুবার হয়েছে যে, এসব রক্তপাত শুধু খোদার নামেই করা হয়েছে এবং ধর্মের আঁড়ালে নৃশংসভাবে মানুষের রক্ত-স্রোত প্রবাহিত করা হয়েছে। অতীতে যেমন এসব ঘটেছে, আজও তা ঘটছে। মানুষ তার এসব কার্যকলাপের প্রতি লক্ষ্য করে অনেক সময় নিরাশ হয়ে ভেবেছে, এ জন্যই কি মানুষের জন্ম হয়েছিল? ধর্মই একমাত্র তার ভরসার স্থল ছিল। আশা ছিল তা মানুষকে মনুষ্যত্বের নীতি শিক্ষা দিবে। কিন্তু এ অঞ্চলগুলোও রঞ্জিত হয়ে রয়েছে।

স্বতঃই মনে প্রশ্ন জাগে এবং সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সৃষ্টির সে ঘটনার প্রতি চিত্ত নিবিষ্ট হয়, যা কুরআন ও বাইবেল, উভয় ধর্মগ্রন্থে বিবৃত আছে। কুরআন করীমে সে ঘটনা এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

"ঐ সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন তোমার স্রষ্টা ও পালন কর্তা রব্ব্ ফেরেশতাদেরকে বললেন : আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি সৃষ্টি করব। ফেরেশতারা বলল ঃ আপনি কি সেখানে এমন কারো উদ্ভব করবেন, যে এর মধ্যে বিবাদ, বিসম্বাদ ও রক্তপাত করবে? অথচ আমরা আপনার প্রশংসা করি এবং আপনার নিরঞ্জন হওয়ার গীত গাই ও আপনার পবিত্রতার জয়গান করি। খোদা তা'লা বললেন ঃ আমি ঐ সমুদয় বিষয়ই জানি, যে সম্পর্কে তোমরা মোটেও অবগত নও। [সূরাহ্ বাকারা, রুকু ৪]

খোদা তা'লা এবং ফেরেশতাদের বাক্যালাপ পড়ে মানুষ হয়ত কিছুক্ষণের জন্য এক অদ্ভুত দ্বিধার মধ্যে পতিত হবে। কারণ ধর্মের ইতিহাসের প্রতি এক নজর চেয়ে দেখলে বাহ্যিক দৃষ্টিতে ফেরেশতাদের কথাই ঠিক বলে মনে হয় এবং মানুষ এই ধাঁধায় পড়ে যায় যে, ফেরেশতাদের কথাই যদি ঠিক ছিল, তবে খোদা তা'লা কেন তাদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করলেন এবং তাঁর প্রতিনিধিত্ব, তথা নবুওতের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে আপত্তি করা হয়েছিল, তা রদ করলেন কেন? এই আপত্তির আওতায় সকলের চেয়ে অধিক, তার মুখ্য প্রতিনিধি, হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলেহী ওয়াসাল্লাম পতিত হন। আমরা পৃথিবীর যে কোন অংশের ধর্মের ইতিহাস যখন পাঠ করি যথা উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম, যে কোন অঞ্চলের হোক, তখন সর্বত্র আমরা ধর্মের নামে অনুষ্ঠিত এমন সব অত্যাচারের সন্ধান পাই, যা পড়লে ভয়ে শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে এবং নিরাশায় চোক মুদে আসে। তখন মনে মনে এমনভাবে প্রবাহের সৃষ্টি হয় ঃ

"হুঈ জিন সে তাওয়াক্কু সুস্তগি কি দাদ পানে কি,

উওহ হাম সে ভি যিয়াদাহ্ খুস্তায়ে তেগে সিতাম নিকলে।"

ধর্মের নিকট আশা করা হয়েছিল যে, এটা মানবতাকে অশান্তি ও রক্তপাত হতে অব্যাহতি দিবে। কিন্তু তা নিজেই মানবতার রক্তে আপাদমস্তক রঞ্জিত!

পক্ষান্তরে যখন খোদা তা'লার সংশয়াতীত মীমাংসার প্রতি মানুষ লক্ষ্য করে যে, ধর্ম কখনও অশান্তি ও রক্তপাতের উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়নি এবং এইরূপ বিরূপ ধারণা জ্ঞানাভাবের ফলে জন্মে এবং এর সম্পূর্ণ অলীক, তখন বিস্ময়ের অবসান না হলেও আবার নৈরাশ্যের আঁধারের মধ্যে ক্ষীণ আশার সঞ্চার হয়। মানুষ আনন্দ ও বিস্ময় মিশ্রিত হৃদয়াবেগের সাথে খোদা তা'লার এই ফয়সালাকে দেখে। যে মুখ্য প্রতিনিধি সম্বন্ধে ফেরেশতারা এই সন্দেহ প্রকাশ করেছিল যে, তিনি পৃথিবীতে অশান্তি ঘটাবেন, তিনি খোদা তা'লার নিকট শ্রেষ্ঠ ধর্ম-সংস্কারক হওয়ার মর্যাদা লাভ করলেন এবং তাঁরই প্রবর্তিত ধর্মের নাম ইসলাম বা শান্তির ধর্ম রাখা হয়েছে। প্রশ্ন তবুও থেকে যায়। স্বীকার করি, আলেমুল গায়েব, অন্তর্যামী খোদার ফয়সালা ঠিক এবং অবশিষ্ট সকল অনুমান ভুল। কিন্তু ধর্মের ইতিহাসে সে স্থানটি কোথায়, যেখানে পৌঁছে আমাদের দৃষ্টি ব্যর্থ হয় এবং কোন্ সে ভুল যার বিপাকে পড়ে কোন কোন ধর্ম-বিরোধী একথা বলে যে, ধর্ম শান্তির নামে অশান্তি ও নিরাপত্তার নামে অন্যায় রক্তপাত শিক্ষা দেয়।

কুরআন করীম অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে এই ভ্রম চিহ্নিত করে দিয়েছেন এবং বিশদভাবে বার বার ইতিহাসের বিভিন্ন বরাত দিয়ে প্রমাণ করেন যে, ধর্মের নামে জুলুমকারীরা সর্বদা হয়ত নিজেরাই ধর্মহীন ছিল অথবা ঐ সকল লোক ছিল, যাদের মধ্যে ধর্মের লেশমাত্র অবশিষ্ট ছিল না। যাদের ধর্ম দীর্ঘকালের আবর্তে পড়ে বিকৃত হয়ে অন্যরূপ ধারণ করেছিল, বা এই অত্যাচারের জন্য দায়ী ঐ সকল ধর্মীয় আলেম, ধর্মের সাথে যাদের নাম মাত্র সম্পর্ক; যাদের চিত্ত আধ্যাত্মিকতা, দয়া, সহানুভূতি ও মানব সেবার পবিত্র ধর্মীয় আবেগ শূন্য হওয়ার ফলে ধূর্ততা, কপটতা ও জিঘাংসার আকারে পরিণত হয়েছিল। সুতরাং এই জাতীয় ধর্ম নেতাগণের কুকর্ম ধর্মের প্রতি আরোপ করা এক মহা অবিচার। প্রকৃত কথা, অনুগ্রহরাজির মূল উৎস খোদা কোন ধর্মাবলম্বীকেই তাঁর বান্দাদের প্রতি জুলুম করার শিক্ষা দিতে পারেন না।

বিশ্বের ইতিহাস হতে কোন কোন দৃষ্টান্ত উপস্থিত করে কুরআন করীম দৃশ্যের পট পরিবর্তন করে দিয়েছে। তা এমনভাবে ঘটনার অবগুণ্ঠন মোচন করেছে যে, অভিযোগকারীরাই অভিযুক্ত হয়ে পড়েছে। কুরআন করীম স্বীয় দাবীর সমর্থনে নবীগণের প্রাথমিক যুগকে মাপকাঠি ও কষ্ঠিপাথররূপে পেশ করে এবং বার বার নবীদের জামাতের উল্লেখ করে তাঁদের সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত করেছে যে, ধর্মের দিক হতে যদি অত্যাচারকে আইনানুগ করা হত, তা হলে স্পষ্টতঃ সর্বাপেক্ষা অত্যাচারী স্বয়ং প্রবর্তকগণই হতেন বা তাঁদের অনুবর্তীরা যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে তাঁদের নিকট হতে তাঁদের প্রবর্তিত ধর্ম শিক্ষা করেছিলেন এবং তাঁদের আদর্শের ছাঁচে নিজেদের জীবনকে গড়ে তুলেছিলেন, এবং তারা অত্যাচারী বলে সাব্যস্ত হত না, যারা বহু পরে জন্মগ্রহণ করে এবং বিকৃত অবস্থায় ধর্মকে প্রাপ্ত হয় ও দেখে, অথবা নিজেদের নৈতিক অবস্থার অবনতির ফলে, যারা নিজ নিজ ধারণার বশবর্তী হয়ে চলে এবং প্রকৃত ধর্মকে পিছনে ফেলে ধর্মের নামে জোর জুলুম চালায়।

ধর্মের যে ইতিহাস কুরআন করীমে বর্ণিত হয়েছে, তাতে বারংবার আমরা এই দৃশ্য দেখতে পাই যে, ধর্মের নামে জগতে জুলুম অনুষ্ঠিত হয় সত্য, কিন্তু এটা ধর্মহীন লোকদের কাজ। বল প্রয়োগ করা হয় খোদার নামে, কিন্তু খোদা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ লোকেরাই এরূপ কাজ করে থাকে। কুরআন করীমে হযরত নূহ (আ.) সম্বন্ধে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি যখন পৃথিবীর অধিবাসীদেরকে ধর্মপথ ও পুণ্যের দিকে আহ্বান জানান, তখন তিনি কোন অত্যাচার করেন নি; যারা ধর্মের নাম পর্যন্ত জানত না তারাই অত্যাচারী ছিল। কুরআন করীমে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, তারা হযরত নূহ (আ.) এর বাণী শুনে বলেছিল ঃ

"হে নূহ! যদি তুমি এই ধর্ম হতে বিরত না হও এবং তোমার চালচলন পরিবর্তন না কর, তবে নিশ্চয়ই তোমাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হবে।" (সূরা শোয়ারা, রুকু ৬)

মোট কথা, কুরআন করীমের দৃষ্টিতে ধার্মিকদের ওপরেই ধর্মের নামে জুলুম করা হয়েছে, ধার্মিকরা কখনও কারো ওপর জুলুম করেন নি।

হযরত নূহ (আ.) এর পর হযরত ইবরাহীম (আ.) এর দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ.) শান্তি, প্রেম, সহানুভূতি ও গাম্ভীর্যের সাথে পৃথিবীবাসীকে খোদা তা'লার সত্য পথের দিকে আহ্বান করেন। তাঁর হাতে কোন তরবারি ছিল না। কারো ওপর তিনি কোন বল প্রয়োগ করেন নি। কোন প্রকার জুলুম করার উপকরণও তাঁর নিকট ছিল না। কিন্তু ইতোপূর্বে নূহ (আ.) এর সময়কার ধর্মহীন লোকেরা যা বলেছিল, তাঁর জাতির নেতারা হুবহু তা-ই বলল। তারা বলেছিল ঃ "যদি তুমি এই বিশ্বাস ও প্রচার পরিত্যাগ কর, তা হলে ভাল কথা। অন্যথায় তোমাকে আমরা প্রস্তরাঘাতে হত্যা করবো।" (সূরা, মরিয়ম, রুকু ৩)

আজর এই কথাগুলি হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে বলেছিল। এখানেও দেখুন, হযরত নূহ (আ.) এর সময় ধর্মহীন ব্যক্তিরা যে কথা হযরত নূহ (আ.)-কে বলেছিল ঠিক একই কথা ইবরাহীম (আ.)-এর বিরুদ্ধে উচ্চারিত হয়েছিল। হযরত ইবরাহীম (আ.) এর সময়ের ধর্মহীন ব্যক্তিরাও সেরূপ একই ভাষায় তাঁকে শাসিয়েছিল। তারা শুধু শাসিয়েই থামে নি, পরন্তু হযরত নূহ (আ.) ও তাঁর জাতির ওপর যে জুলুম করা হয়েছিল, তা এক সর্বজনবিদিত সত্য। তাঁকে অবজ্ঞার পাত্র করা হয়েছিল। তাঁকে বিদ্রুপ করা হয়েছিল। তাঁর প্রতি কঠোর আচরণ করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি গাম্ভীর্য ও সহিষ্ণুতার সাথে অবিচলিত রইলেন। হযরত ইবরাহীম (আ.) এর বিপক্ষেও বিরোধিতা ও অশান্তির এক ভীষণ আগুন জ্বালানো হয়েছিল এবং বাহ্যিকভাবে তাঁকে জ্বলন্ত আগুনে জীবন্ত দাহ করবার চেষ্টা করা হয়েছিল।

হযরত লূত (আ.) এর অস্বীকারকারীরা ধর্ম কি তা জানত না। তারাও ধর্মের নামেই হযরত লূত (আ.) ও তাঁর অনুসরণকারীদের ওপরে অত্যাচার করেছিল। তাঁদেরকেও একই জাতীয় ধমক দেয়া হয়েছিল। হযরত লূত (আ.) এর অস্বীকারকারীরা তাঁকে দেশ হতে বিতাড়নের হুমকি দিয়েছিল। তারা বার বার তাঁর বাড়ীর ওপর চড়াও করে ধমক দিয়েছিল ও ভয় প্রদর্শন করেছিল, যাতে তিনি শান্তিপূর্ণ ধর্ম প্রচারে বিরত হন।

হযরত শোয়েব (আ.) এর বিরুদ্ধাচারীরাও এই নীতিই অবলম্বন করেছিল। তারা হযরত শোয়েব (আ.)কে বলেছিল ঃ

"হে শোয়েব, হয় আমরা তোমাকে এবং যারা তোমাকে গ্রহণ করেছে, তাদেরকে শহর হতে বের করে দিব, নতুবা তোমাকে আমাদের ধর্মে নিশ্চয়ই ফিরে আসতে হবে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কি আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে?" [সূরা আল-আ'রাফ, ৮৯ আয়াত]

এর মাধ্যমে তারা তাঁকে সাবধান করে বলল, তাঁর প্রতি এত কঠোরতা অবলম্বন করা হবে ও তাঁকে এত উৎপীড়ন করা হবে যে, তাঁর পক্ষে জীবন যাপন অসহনীয় হয়ে পড়বে। তিনি এক ধর্ম ছেড়ে অন্য ধর্ম গ্রহণ করেছেন। তাঁকে তা পরিত্যাগ করতে হবে। এর জন্য তারা তাঁকে সুযোগ প্রদান করছে এবং সতর্ক করছে। এতে হযরত শোয়েব তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন।

"আমাদের হৃদয় তোমাদের ধর্মকে সমর্থন না করলেও কি এটা করতে হবে? পৃথিবীতে কি এভাবে কাউকে কোন ধর্মগ্রহণে বা তা অনুশীলনে বাধ্য করা যায়? যদি কারো হৃদয় কোন ধর্মের মিথ্যা হওয়ার সাক্ষ্য দেয় এবং সে ঐ ধর্ম হতে স্বতঃ পলায়ন পূর্বক শান্তিপূর্ণ কোন ধর্মের আশ্রয়ে এসে নিরাপদ হতে চায়, তবুও কি তার হৃদয়ের সাক্ষ্যের বিরুদ্ধে, তার বিবেকের আদেশের বিরুদ্ধে এমন কোন মত গহণে তাকে বাধ্য করা যায়, যাতে সে হৃদয়ে শান্তি লাভ করে না?

মুরতাদ (স্বধর্মত্যাগী)-কে হত্যাদণ্ডে দণ্ডিত করার বিরুদ্ধে হযরত শোয়েব (আ.)-এর এই যুক্তি অকাট্য অখণ্ডনীয়। আজ পর্যন্ত এর উত্তর কোন রক্তপিপাসুই দিতে পারে নি। কারণ প্রত্যেক মানুষের বুদ্ধি ও হৃদয় সর্বদা এই সাক্ষ্য দেয় যে, তরবারি দ্বারা অতীতেও কোন সময় হৃদয়ের ওপর প্রভুত্ব করা যায় নি এবং ভবিষ্যতেও করা যাবে না। তরবারি দ্বারা অস্থি, মাংস ও চর্মের ওপর আধিপত্য লাভ করা যেতে পারে কিন্তু বুদ্ধি, হৃদয়ের আবেগ ও ধর্ম প্রত্যয়ের জগতে এর কোন প্রবেশাধিকার নেই। এটা মানব প্রকৃতির এক অপরিবর্তনীয় অন্তর্ধ্বনি। এটা সেই আদি প্রকৃতি যা হযরত আদম (আ.) প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং পৃথিবীর শেষ মানুষও এই প্রকৃতি নিয়েই দেহ ত্যাগ করবে। মানুষের এই স্বভাব সিদ্ধ ধ্বনি কখনও পরিবর্তন হবার নয়। ধর্ম সম্বন্ধে আজ পথ-প্রদর্শকরা যে সকল উৎপীড়িত ব্যক্তিকে মুরতাদ আখ্যা দিয়ে ধর্মের নামে বাধ্য বলে নির্ধারিত করেছে, তাদের উৎপীড়িত চিত্তের বিলাপ ধ্বনি সদাই আকাশ বাতাসকে মুখরিত করতে থাকবে যে, "আমাদের হৃদয় যখন তোমাদের বিকৃত ধর্ম-বিশ্বাসের প্রতি একেবারেই আস্থাহীন হয়ে পড়ছে, তখনও কি তোমরা তা আমাদেরকে মানবার জন্য বাধ্য করতে চাও?" কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, সর্বদা এরূপ ঘটে আসছে। ধর্মহীন ব্যক্তিরা প্রত্যেক নবী ও তাঁর জাতির ওপর ইরতেদাদ বা স্বধর্ম ত্যাগের ফতওয়া দিয়েছে, তাদেরকে বধ্য বলে নির্ধারণ করছে এবং অত্যাচার ও নিপীড়নের এমন সব পন্থা আবিষ্কার করছে যে, ঐগুলি নিয়ে আলোচনা করতে গেলেও মানবতার অবমাননা করা হয়।

আর এক ঘটনা দেখুন। হযরত মূসা (আ.) এবং তাঁর অনুবর্তীদের প্রতিও এমন ব্যবহার করা হয়েছে। ফেরাউন তা-ই বলেছিল, যা তার পূর্ববর্তী জাতিগুলোর তথাকথিত ধর্মীয় নেতারা বলেছিল এবং সেই অত্যাচারের পথই ধরেছিল, যা খোদার মনোনীতদের বিপক্ষে আদিকাল হতে জালেমরা অবলম্বন করে এসেছে।

দৃষ্টান্তস্থলে, ফেরাউন তার অনুচরদেরকে আদেশ করেছিল ঃ 'হে আমার অনুগত, আজ্ঞানুবর্তী রাষ্ট্রের ক্ষমতাশীল ব্যক্তিরা! মূসার ওপর যারা ঈমান এনেছে, আপনারা তাদেরকে বল প্রয়োগ দ্বারা নিবৃত্ত রাখুন, তাদের পুত্রদেরকে বধ করুন এবং তাদের কন্যাদেরকে জীবিত রাখুন। [সূরা মুমেন, রুকু ৩]

অতএব দেখুন, স্বধর্ম ত্যাগের অপরাধের এই শাস্তি নবীদের জামাতগুলো কখনও ধর্মের নামে অবিশ্বাসীদেরকে দেন নি। পক্ষান্তরে অবিশ্বাসীরা নবীদের জামাতগুলোকে এ শাস্তি দিয়েছে। সেরূপ হযরত মূসা এর পরে হযরত ঈসা (আ.) কে কত নির্যাতন সইতে হয়েছে। এমন কি শত্রুরা কার্যতঃ তাঁকে ক্রুশে বিদ্ধ করে বধ করবার চেষ্টা করে এবং তাঁর শিষ্যদের ওপরও নানাপ্রকার অত্যাচার করে। বস্তুতঃ উৎপীড়ন, নির্যাতন ও জুলুম ধারাবাহিকতার সাথে এখন পর্যন্ত ধর্মের নামে অব্যাহতভাবে চলে আসছে। স্বধর্ম-ত্যাগীর শাস্তি বলে যা সর্বদা কথিত হয়ে আসছে, এর কোন সনদ কোন ধর্মগ্রন্থে পাওয়া যায়নি। ধর্মগ্রন্থ বলতে আমি ঐ ধর্মগ্রন্থগুলোকে মনে করি, যা খোদা তা'লা তাঁর নবীগণের ওপর অবতীর্ণ করেন। ঐ গ্রন্থগুলোর বিকৃত অবস্থায় নবীগণের অবর্তমানে শত শত বছর পর যদি পরবর্তী অসাধু ব্যক্তিগণ তাতে হস্তক্ষেপ করে বা নিজেদের ধারণা প্রবিষ্ট করে দিয়ে তাতে জুলুম করবার শিক্ষা সংযুক্ত করে দিয়ে থাকে, তবে ঐশী ধর্মগ্রন্থগুলোর এতে কোন দায়িত্ব নেই।

কুরআন করীম ধর্মের ইতিহাসের অখণ্ডনীয় বরাদ দিয়ে এটা প্রমাণ করেছে যে, আম্বিয়া (আ.) ও তাঁদের অকৃত্রিম শিষ্যরা পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা নিগৃহীত হয়েছিলেন। তাঁদের প্রতি কঠোরতম অত্যাচার করা হয়েছে। কিন্তু তাঁরা অত্যন্ত ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সাথে শুধু আল্লাহ্ তা'লার উদ্দেশ্যে ঐ সকল অত্যাচার সহ্য করেছেন। এ ইতিহাস পাঠের পর পৃথিবীর কোন মানুষই, যার কিছু মাত্র বুদ্ধি আছে, এই দাবী করতে পারে না যে, ধর্মের দিক হতে স্বধর্ম-ত্যাগের কারণে কখনও কারো ওপর যুলুম করা হয়েছে। খোদার নবীরা এক ধর্ম ছেড়ে অন্য ধর্ম গ্রহণের শিক্ষা দিয়ে থাকেন। যখন তাঁরা স্বয়ং এই শিক্ষা দেন, তখন তাঁরা শুধু ধর্মান্তর গ্রহণের কারণে কারো প্রতি বল প্রয়োগ বা জুলুম করা কিরূপে সহ্য করতে পারেন? কুরআন করীম হতে এটাও জানা যায় যে, শুধু নবীদের জামাতগুলোই নয়, তাঁদের পরলোক গমনের শত শত বছর পরেও এরূপ অনেক মহান ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যাঁদের প্রতি সম-সাময়িক জালেমরা ধর্মের নামে জুলুম করেছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, খোদা তা'লার সন্তুষ্টি, সমর্থন বা সাহায্য তাদের সাথে ছিল না। ধর্মের সাথে এই এ অত্যাচারের দূরবর্তী কোন সম্পর্কও নেই।

এ প্রসঙ্গে কুরআন করীমে আসহাবে কাহাফের দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছে। তারা সেই সকল খ্রিষ্টান, যারা খ্রিষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত শত্রুদের দ্বারা নিপীড়িত হয়েছিলেন। তাদেরকে এত নির্যাতন করা হয়েছিল এবং তাদের ওপর যেভাবে নির্মম অত্যাচার করা হয়েছিল, তা স্মরণে আজও হৃদয় ফেটে যায়। আমি স্বয়ং সেই এমারতগুলো দেখেছি, যেখানে খ্রিষ্টানদের ওপর অত্যাচার করা হত। সেই এরামতগুলো কলিসিয়ম (collisium) নামে খ্যাত। প্রাচীন রোমান শাসন আমলে কলিসিয়ম এক প্রকার থিয়েটার বা রঙ্গালয় বিশেষ ছিল! সেখানে পাহ্‌লওয়ানদের মল্ল-যুদ্ধ এবং ব্যাঘ্র ও মহিষের লড়াই হত।

যে সময়ের কথা কুরআন করীমে বর্ণিত হয়েছে, সেই সময়ে এ রাঙ্গালয়গুলো খ্রিষ্টানদের প্রতি অত্যাচারগার রূপে ব্যবহৃত হতো। এক দিকে, পিঞ্জরের মধ্যে ক্ষুধার্ত সিংহ, ব্যাঘ্র ও অন্যান্য হিংস্র বন্য জন্তুগুলোকে অনেক দিন যাবত অনাহারে আবদ্ধ রাখা হতো এবং অন্যদিকে সেই খ্রিষ্টানদেরকেও পিঞ্জরের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখা হতো, যাদের সম্বন্ধে তৎকালীন ধর্মীয় নেতারা মুরতাদ হওয়ার ফতওয়া দিত, যেহেতু তারা এক ধর্ম ছেড়ে অন্য ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। পিঞ্জরের মধ্যে একদিকে এ সকল মুরতাদদেরকে অনশনে, অনাহারে, বস্ত্রহীন অবস্থায়, নগ্নদেহে রাখা হতো। তাদেরকে দিনের পর দিন খাদ্য ও পানীয় হতে বঞ্চিত রাখা হতো, যার ফলে পিঞ্জর হতে রাঙ্গালয়ের লৌহ চক্রের মধ্যে বহিষ্কৃত হবার সময় তারা দাঁড়াইতে পর্যন্ত পারতেন না এবং অন্যদিকে ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হিংস্র জন্তুগুলোকে যখন পিঞ্জর হতে সেই লৌহচক্রের মধ্যে তাদের দিকে ছেড়ে দেয়া হত, তখন তারা হিংস্রতর হয়ে ভীষণ গর্জন সহকারে বিদ্যুৎগতিতে মানব শিকারগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দেখতে দেখতে তাদের হাড়গুলো পর্যন্ত চিবিয়ে খেয়ে ফেলত। দর্শকে ভরা হলগুলো এই দৃশ্যে হাসির উচ্চরোলে ভরে উঠত। চতুর্দিকে রব হত, 'ধর্মান্তর গ্রহণকারী মুরতাদদের শাস্তি এটাই।'

দর্শকরা সেদিন সন্ধ্যায় উচ্চ রবে হাসি তামাসা করতে করতে বাড়ী ফিরে দাবী করত যে, ধর্মান্তর গ্রহণ বিপ্লব থামাবার জন্য এটা এক চকৎকার কার্যকরী উপায়! কখনও ক্ষুধার্ত ক্ষিপ্ত মহিষগুলোকে তাদের দিকে ছেড়ে দেয়া হত। ঐ মহিষগুলো অভিনব পরিবেশ ও বিরাট জনতার ভীতিপূর্ণ দৃশ্যে উন্মত্তবৎ হয়ে পড়ত। এমন সময়ে সেই সব নিগৃহীত খ্রিষ্টানদেরকে তাদের দিকে বিতাড়িত হয়ে আসতে দেখে তাদের চক্ষুগুলো রক্তপূর্ণ হয়ে উঠত। রাগে, দ্বেষে ও হিংস্রতায় তারা ভীষণ রূপ ধারণ করত এবং কামারের হাপরের ন্যায় এদের নিঃশ্বাস সশব্দে বের হতে থাকত। তারা প্রতিহিংসায় জ্বলে সাপের ফোঁপানির ন্যায় বিশেষ শব্দ সহকারে শ্বাস প্রশ্বাস নিতে নিতে মাথা নুইয়ে তাদের দুর্বল, নিরীহ নিরুপায় শিকারগুলোকে আক্রমণ করত। কখনও তাদেরকে শৃঙ্গে বিদ্ধ করত। আবার কখনও তাদেরকে পদ-তলে নিষ্পেষণ করত। নিগৃহিত ব্যক্তিদের ব্যথা নিঃসৃত দীর্ঘশ্বাসগুলো কৌতুহলমত্ত দর্শকদের কোলাহলের মধ্যে বিলীন হয়ে যেত।

কিন্তু ঐ ধর্মবিশ্বাসী মু'মিনরা দৃঢ়তার কোনই স্খলন ঘটত না। দারুণ ক্ষুৎপিপাসার ফলে তাদের কৃশ ও দুর্বল পাগুলো কাঁপলেও, তাদের ঈমান কম্পিত হত না। তারা ঈমানের বলে বলীয়ান হয়ে অতুলনীয় সাহসিকতার সাথে সুনিশ্চিত মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হতেন। কখনও তারা হিংস্র জন্তুদের ভক্ষ্য হয়েছেন, কখনও তারা বন্য মহিষের শৃঙ্গের মালা হয়ে গিয়েছেন।

এই অত্যাচারের ধারা বিভিন্ন সময়ে প্রকাশমান হয়ে ৩০০ বছর ব্যাপী খ্রিষ্টানদের ওপর চলতে থাকে। অবশেষে, যখন তারা দেখতে পেলেন যে, তথাকথিত মানুষের মধ্যে তাদের মাথা লুকাবার স্থান নেই, তখন তারা ভূ-পৃষ্ঠ ছেড়ে মাটির নীচে গুহায় গমন করলেন। তারা গুহার মধ্যে ইঁদুর, কীট, পোকা, সর্প ও বিচ্ছুর সাথে বাস করতে নিরাপদ বোধ করলেন কিন্তু মাটির ওপর বসবাসকারী মানুষের মধ্যে

তাদের জন্য কোন স্থান ছিল না। কারণ এই বিষধর প্রাণীগুলো, দীর্ঘ পোশাক পরিহিত ধর্মনেতাদের অপেক্ষা তাদের জন্য কম ক্ষতিকর ছিল।

গুহাবাসী আসহাবে-কাহাফ ছাড়াও কুরআন করীমে একেশ্বরবাদী আদি খ্রিষ্টানদের সম্বন্ধেও উল্লেখ রয়েছে। তাদেরকে ধর্মহীন শাসকরা ধর্মের নামেই জীবন্ত দগ্ধ করেছে। তাদের অপরাধ মাত্র এটাই ছিল যে, তারা সর্বশক্তিমান, মহা গুণময় খোদার ওপর ঈমান এনেছিলেন। সূরা আল বুরুজে তাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন ।

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ ۙ﴿۲﴾ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ ۙ﴿۳﴾
وَشَاهِدٍ وَّمَشْهُوْدٍ ۙ﴿۴﴾ قُتِلَ اَصْحٰبُ الْاُخْدُوْدِ ۙ﴿۵﴾
النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ ۙ﴿۶﴾ اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُوْدٌ ۙ﴿۷﴾
وَّهُمْ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُوْدٌ ؕ﴿۸﴾
وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلَّاۤ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ
الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۙ﴿۹﴾
الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ
وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ ؕ﴿۱۰﴾

নিম্নে এর সরল অনুবাদ দেয়া হল ঃ

"কসম! রাশি সম্বলিত আকাশের ও প্রতিশ্রুত দিনের এবং এক মহান সাক্ষীর ও সেই মহাপুরুষের, যাঁর সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেয়া হয়েছে। পরিখার অধিকারীরা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে অর্থাৎ সেই অগ্নি প্রজ্জলনকারীরা, যারা পরিখার মধ্যে অগ্নিকে ইন্ধন দ্বারা খুব প্রজ্জলিত করেছিল। কতই ভয়াবহ ছিল ঐ সময়, যখন তারা পরিখাগুলোর পাড়ে বসে দগ্ধমান মু'মিনদের অবস্থা দেখছিল এবং তাদের অসন্তুষ্টির কারণ এটা ছাড়া আর কিছুই ছিল না যে, তাঁরা সর্বশক্তিমান ও মহাগুণময় খোদার ওপর ঈমান এনেছিলেন, যিনি আকাশরাজি ও পৃথিবীর সর্বময় কর্তা। খোদা তা'লা সকল বিষয়েই নিরীক্ষক।" (সূরা বুরুজ: ২-১০)

ধর্মের নামে যারা নৃশংসতা করে, তারা নিজেরাই প্রকৃতপক্ষে ধর্মহীন তার আরো একটি অখণ্ডনীয় প্রমাণ কুরআন করীমে দেয়া হয়েছে। এই জালেমরা খোদার নামে খোদার ইবাদতে বাধা দেয়। তাদের এই অত্যাচার মু'মিনদের পক্ষে যাবতীয় দৈহিক কষ্ট হতে অধিকতর কষ্টদায়ক। আল্লাহ্ তা'লা সূরা বাকারার ১৪ রুকুতে বলেন ঃ

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ اَنْ
يُّذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ وَسَعٰى فِىْ خَرَابِهَا ؕ

"ধর্মের ঐ সব মিথ্যাদাবীদার হতে বড় জালেম কেউ হতে পারে কি, যারা খোদার নাম নিয়ে খোদার ইবাদতে মানুষকে বাধা দেয় এবং মসজিদগুলোতে তাঁর নাম উচ্চারণ করতে নিষেধ করে ও মসজিদগুলোকে উজাড় করবার চেষ্টা করে!" (সূরা বাকারা: ১১৫)

বস্তুতঃ, কুরআন করীম অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও সুন্দর ভাবে ধর্মের বিরুদ্ধে রক্তপাতের অভিযোগকে খণ্ডন করে এবং ধর্মের পবিত্র নামে পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা নৃশংস নির্যাতন হওয়ার কথা স্বীকার করেও কুরআন করীম এটা প্রমাণ করে যে, সত্য ধর্মের খাঁটি অনুবর্তীরা এই অত্যাচার ও উচ্ছৃংখলতার ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে নির্দোষ।

পূর্ববর্তী নবীগণের প্রতি মানুষের ব্যবহার ছিল এরূপ, যখন খোদা তা'লার জ্যোতির পূর্ণ বিকাশ হয়নি। কিন্তু যখন তাঁর জ্যোতির পূর্ণ বিকাশের সময় উপস্থিত হল এবং আরব উপদ্বীপের দিগন্তে পূর্ণ সত্যের মূর্তিমান সূর্য উদিত হল, তখনও ধর্মহীন জালেমরা তাদের রীতির পরিবর্তন করল না। যখন বিশ্ব-সম্রাটের আগমন হল, সহস্র সহস্র বছর যাবৎ আদম সন্তানগণ যাঁর প্রতিক্ষা করছিল, যাঁর পথ চেয়ে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী এ পৃথিবী হতে বিদায় গ্রহণ করলেন, যাঁর জন্য বিশ্বের সৃষ্টি, যার শরীয়ত সকল শরীয়ত অপেক্ষা উজ্জল, যাঁর মর্যাদা সকল নবী হতে উচ্চ, মানবতার সেই শ্রেষ্ঠ বিকাশ, খোদার মহিমা ও গৌরবের প্রকাশস্থল, সকল নবী অপেক্ষা নিষ্কলঙ্ক নবী যখন পৃথিবীতে আবির্ভূত হলেন, তখন তাঁকেও নির্যাতন ও নিপীড়নের লক্ষস্থল করা হল এবং এই অত্যাচার ও উৎপীড়ন এমনই নিদারুন ছিল যে, এর দৃষ্টান্ত ধর্মের ইতিহাসে কোথাও দেখা যায় না।

পূর্ববর্তী নবীদের প্রতি পৃথক পৃথক রকমে যে সকল নির্যাতন করা হয়েছিল, সেই সমুদয় সমষ্টিগতভাবে একা এই নবী ও তাঁর জামাতের ওপর করা হল। প্রখর রৌদ্রে, উত্তপ্ত বালুকায় নগ্নদেহে তাঁদের বুকের ওপর যন্ত্রণাদায়ক ভারী প্রস্তর রাখা হত। মক্কার কঙ্করময় অলিগলিতে মৃত পশুর ন্যায় পায়ে দড়ি বেঁধে তাঁদেরকে টেনে বেড়ান হয়েছিল, বহু বছর পর্যন্ত তাঁদের সাথে পূর্ণ অসহযোগিতা করা হয়েছিল। তাদেরকে ক্ষুৎ-পিপাসায় রেখে দারুণ ক্লেশ দেওয়া হয়েছিল। কখনও তাঁদেরকে সঙ্কীর্ণ অন্ধকার প্রকোষ্ঠে বন্দী করে রাখা হয়েছে। কখনও তাঁদের ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠন করে তাঁদেরকে গৃহ হতে বিতাড়িত করা হয়েছে। কখনও স্ত্রীকে স্বামী হতে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। কখনও স্বামীকে স্ত্রী হতে পৃথক করা হয়েছে। পবিত্র গর্ভবতী মহিলাকে উটের ওপর থেকে ফেলে দিয়ে উচ্চ হর্ষধ্বনি করা হয়েছে। এমন আঘাতের ফলে তাঁরা প্রাণত্যাগ করেছেন। প্রার্থনায় আসীন ব্যক্তিদের ওপর উষ্ট্রের নাড়ীভূরি নিক্ষেপ করা হয়েছে। তাঁদেরকে গালি দেয়া হয়েছে। কর্মশুন্য ভবঘুরে ছোকরারা তাঁদেরকে পথে-ঘাটে অপমানিত করেছে। পৃথিবীর জঘণ্যতম অর্বাচীনেরা তাঁদের ওপর মুষলধারে প্রস্তর বর্ষণ করেছে। পৃথিবীর পবিত্রতম রুধির তায়েফের রাস্তা সিক্ত করেছে। তাঁদের খাদ্যের মধ্যে বিষ দেয়া হয়েছে। যুদ্ধাগ্নি প্রজ্জলিত করা হয়েছে। তরবারি দ্বারা কুরবানীর জন্তুর ন্যায় তাঁদেরকে জবেহ করা হয়েছে। তাঁদের প্রতি তীর ও প্রস্তর বর্ষণ করা হয়েছে। উহুদ প্রান্তর সাক্ষী যে, পাষাণ হৃদয় নরচিশাচরা বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম নিষ্কলঙ্ক ও নিষ্পাপ মহাপুরুষের দাঁত শহীদ করেছিল। বিশ্বাসীদেরকে বর্শায় বিদ্ধ করা হয়েছে। তাঁদের বক্ষ বিদীর্ণ করে কলিজা ছিঁড়ে কাঁচা চর্বন করা হয়েছে। নৃশংস রোমান নরপতিগণ হিংস্র জন্তুর সাহায্যে যা করেছিল, আরবের হিংস্র মানুষেরা নিজেরাই তা করে দিখিয়েছে।

(হযরত মির্যা তাহের আহমদ রাহে. রচিত 'ধর্মের নামে রক্তপাত' পুস্তক-এর বাংলা সংস্করণ, পৃ: ১-১৬, অনুবাদ: মরহুম মৌলবি আলী আনোয়ার এবং চলতিকরণ: মওলানা মামুন উর রশিদ)

ধর্মের নামে যারা নৃশংসতা করে, তারা নিজেরাই প্রকৃতপক্ষে ধর্মহীন।

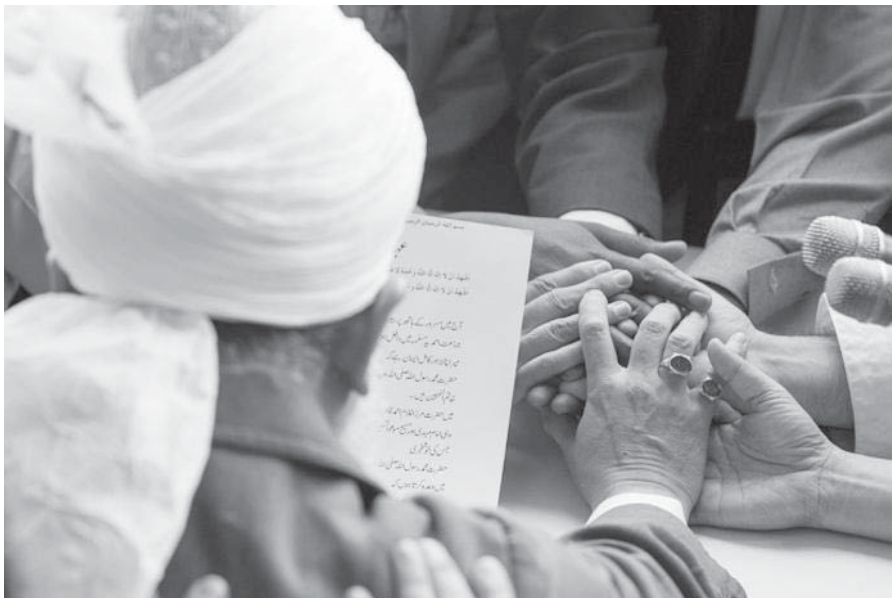

বয়আতের শর্তসমূহ এবং একজন আহমদীর দায়িত্ব ও কর্তব্য

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)

(৮ম কিস্তি)

হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রাযি.) বর্ণনা করেন যে, দোয়া আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে ঝুলে যায় আর যতক্ষণ তুমি তোমার আপনজন নবী (সা.)-এর ওপর দরূদ প্রেরণ না করো ওথেকে কোন অংশই (খোদা তা'লার সকাশে উপস্থাপিত হওয়ার জন্য) উর্ধ্বলোকে উন্নীত হয় না। [তিরিমিযি, কিতাবুস সালাত, বাব-মা জাআ' ফি ফাসলুস সালাত আ'লান্নাবীয়ে (সা.)]

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাযি.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন– কিয়ামত দিবসে লোকদের মধ্য থেকে সেই ব্যক্তি আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী হবে, তাদের মধ্য থেকে যে আমার প্রতি সবচেয়ে বেশী দরূদ প্রেরণকারী ছিল। [প্রাগুক্ত হাদীস গ্রন্থ]

হযরত আকদাস মসীহ মাওউদ (আ.) দরূদ শরীফের কল্যাণরাজি সম্পর্কে নিজস্ব অভিজ্ঞান প্রসঙ্গে এক বর্ণনায় নিম্নোক্ত বাক্যাবলী উপস্থাপন করেছেন। তিনি (আ.) বলেন–

"একবার দরূদ শরীফ পাঠের এমন সুযোগ হলো যে আঁ হযরত (সা.)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণে এক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আমি মুহ্যমান হয়ে রইলাম কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে খোদা তা'লার নৈকট্যের রাস্তা অতীব সূক্ষ্ম যা নবী করীম (সা.)-এর মধ্যবর্তীতা ব্যতিরেকে লাভ করা যায় না। আল্লাহ্ তা'লাও তেমনটা নির্দেশ করেছেন– **ওয়াবতাগু ইলাইহিল ওয়াসিলা...** (আল মায়েদা, ৫:৩৬)। অর্থাৎ তাঁর নৈকট্য লাভে মাধ্যম অবলম্বন করো।

একটা সময় অতিক্রান্ত হবার পর 'কাশফ'-দিব্যদর্শন রত অবস্থায় আমি দেখলাম আমার ঘরে দুইজন ভিস্তিওয়ালা অর্থাৎ পানি পরিবেশনকারী প্রবেশ করলো, একজন অন্দর মহলের প্রবেশ পথ দিয়ে অপরজন বহির্মহল থেকে প্রবেশ হবার পথ দিয়ে ঘরে প্রবেশ করলো আর তাদের কাঁধে ছিল 'নূরের মশক', তারা মুখে বলে চলছিল **হাযা বিমা সাল্লায়তা আ'লা মুহাম্মাদীন**।" [হাকীকাতুল ওহী, টীকা, পৃ: ১২৮, রূহানী খাযায়েন ২২তম খণ্ড, পৃ. ১৩১ এর টীকা]

অর্থাৎ এইসব কল্যাণ 'সেই দরূদ শরীফ' এর কারণে যা তুমি মুহাম্মদ (সা.)-এর উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছিলে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আরও বলেন:

"দরূদ শরীফের বদৌলতে... আমি প্রত্যক্ষ করেছি যে আল্লাহ্ তা'লার কল্যাণরাজি অনুপম নান্দনিক এক জ্যোতিরূপে আঁ হযরত (সা.)-এর প্রতি সম্পাতিত হচ্ছে আর সেখানে পৌঁছে আঁ হযরত (সা.)-এর বক্ষে শোষিত হয়ে যাচ্ছে। অত:পর সেখান থেকে অসংখ্য আলোক রশ্মিপথে তা নির্গত হয়ে প্রত্যেক হক্‌দারের কাছে তার ন্যায্য অংশ পৌঁছে যাচ্ছে। নিশ্চিত যে আঁ হযরত (সা.)-এর মধ্যবর্তীতা ছাড়া কোন কল্যাণ কারও নিকট পৌঁছুতেই পারে না।

দরূদ শরীফ কী? রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মর্যাদাপূর্ণ সেই জ্যোতির্ময়তায় গতি সঞ্চার করা যাতে অসংখ্য আলোকরশ্মিতে উজ্জ্বল পথ বেয়ে আলোর সেই ফল্গুধারা ছড়িয়ে পড়ে। আল্লাহ্ তা'লার আশিস ও কল্যাণ প্রত্যাশী যারা, তাদের জন্য অবশ্য করণীয় যে, তারা অনেক-অনেক বেশী সংখ্যায় দরূদ শরীফ পাঠে মনোনিবেশ করুন যাতে কল্যাণ প্রদায়ী সেই উৎস উদ্বেল হয়ে ওঠে"। [আল হাকাম, ২৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯০৩, পৃ.-৭]

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) প্রসঙ্গত আরও বলেছেন:

মানুষ তো প্রকৃতপক্ষে বান্দা অর্থাৎ 'চাকর', –এর কাজতো এই-ই হয়ে থাকে যে মনিব যে নির্দেশ দেয়, হুবহু তাই সে পালন করে। অনুরূপভাবে, আঁ হযরত (সা.)-এর আশিস পেতে চাইলে তোমাদের জন্য আবশ্যকীয় যে, তাঁর (সা.) অনুগত দাস হয়ে যাও। কুরআন করীমে আল্লাহ্ তা'লা বলেন–

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ

(আল যুমার, ৩৯:৫৪)

এখানে 'বান্দা' বলে আখ্যায়িত করার উদ্দেশ্য 'চাকর'-ই সাধারণ অর্থে আল্লাহ্‌র সৃষ্টি কোন প্রাণী নয়। রাসূল করীম (সা.)-এর বান্দা বা চাকর রূপে নিবেদিত হতে যা জরুরী তা হলো তার (সা.) প্রতি দরূদ পাঠ করা আর তাঁর (সা.) কোন এক নির্দেশেরও

অমান্য না করা আর সমস্ত আদেশ-নির্দেশের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা।" [বদর পত্রিকা, দ্বিতীয় বর্ষ, ১৪তম সংখ্যা, ২৪ এপ্রিল ১৯০৩ পৃ. ১০৯]

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) মহানবী (সা.)-এর প্রতি এভাবেও দরূদ পাঠ করতেন:...

"আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আ'লাইহি ওয়া আলিহি বি আ'দাদি হাম্মিহি ওয়া গাম্মিহি ওয়া হুযনিহী লি হাযিহিল উম্মাতি ওয়া আনযিল আ'লাইহি আনওয়ারা রাহমাতিকা ইলাল আবাদি"

অর্থাৎ– হে আল্লাহ্! দরূদ ও সালাম আর কল্যাণরাজি প্রেরণ করো তাঁর (সা.) প্রতি সেই সাথে তাঁর (সা.) অনুসারীদের প্রতি। এতোটাই অধিক পরিমাণে কৃপা ও আশিস দান করো যত বেশী পরিমাণে তিনি (সা.)-এর হৃদয় উদ্বেগাকুল থাকতো এই উম্মতের জন্য আরও তাঁর (সা.) প্রতি তোমার নিজস্ব রহমতের নূর সর্বক্ষণ অবতীর্ণ করতেই থাকো। [বারাকাতুদ্ দোয়া, রূহানী খাযায়েন, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ.-১১]

প্রতিনিয়ত ইস্তেগফারে রত থাকো

এই তৃতীয় শর্তে 'ইস্তেগফার'এর বিষয়ও উল্লেখিত হয়েছে। পবিত্র কুরআন করীমে আল্লাহ্ তা'লা বলেন–

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا ۙ﴿۱۱﴾
يُّرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ۙ﴿۱۲﴾
وَّيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ
لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّيَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهٰرًا ؕ﴿۱۳﴾

(সূরা নূহ, ৭১:১১-১৩)

অতএব, আমি বললাম, নিজ প্রভু-প্রতিপালকের সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করো নিশ্চয় তিনি পরম ক্ষমাকারী। তিনি তোমাদের প্রতি অবিরাম বর্ষণকারী মেঘমালা পাঠাবেন, সেই সাথে তিনি ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি দ্বারা তোমাদের সমৃদ্ধশালী করবেন, আরও দিবেন বিভিন্ন বাগানসমূহ আর বইয়ে দিবেন নদী ও ঝর্ণাধারা।

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ۝﴿۴﴾

(সূরা আন নসর, ১১০:৪)

অতএব নিজ প্রভু-প্রতিপালকের প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার সাথে তাঁর মহিমাগীতি করো আর সেই সাথে নিজ দুর্বলতা স্বীকার করে তার সমীপে শক্তি প্রার্থনা করে ক্ষমা ভিক্ষা করো। নিশ্চয় তিনি বার বার তওবা কবুলকারী।

এ প্রসঙ্গে একটি হাদীস রয়েছে:

আবু বরদাহ বিন আবু মূসা (রাযি.) তার পিতা আবু মূসা (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন– আল্লাহ্ তা'লা আমার উম্মতকে দু'টি আমানত পৌঁছানোর ব্যাপারে আমার প্রতি ওহী নাযিল করেছেন। যা হলো–

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ ۚ
وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ
يَسْتَغْفِرُوْنَ ﴿۳۴﴾

(সূরা আল আনফাল, ৮:৩৪)

অর্থাৎ– আল্লাহ্ এমন নন যে, তুমি তাদের মাঝে রয়েছ অথচ তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন এবং আল্লাহ্ এমনও নন যে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে অথচ তিনি তাদের শাস্তি দিবেন। অতএব, আমি যখন তাদের ছেড়ে যাবো তখন কিয়ামত দিবস নাগাদ ইস্তেগফারকে তাদের সাথী করে দিয়ে যাবো।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে– রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি **'ইস্তেগফার'**-এর সাথে আঁকড়ে থাকে (অর্থাৎ ইস্তেগফারেই সর্বদা নিয়োজিত থাকে) আল্লাহ্ তা'লা তাকে সর্ব প্রকার বিপদ-আপদ থেকে উদ্ধারের পথ সৃষ্টি করে দেন আর প্রত্যেক দূরাবস্থা থেকে উত্তরণের রাস্তা বের করে দেন আর তাকে ঐ সমস্ত রাস্তায় রিয্ক (জীবিকা) দান করেন যা সে ধারণাও করতে পারে না'। (সুনান আবি দাউদ, কিতাবুল বিতর, বাব ফিল ইস্তেগফার)

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন:

"...ইস্তেগফার, যা ঈমানের শিকড়ে দৃঢ়তার শক্তি যোগায় পবিত্র কুরআন শরীফে তা দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এক হল, পাপের প্রকাশ, যা একাকী অবস্থায় সংগোপনে উত্তেজিত হয়ে ওঠে, একে রুখে দিতে নিজ হৃদয়কে খোদার প্রেমে শক্তিশালী করে খোদার মধ্যে বিলীন হয়ে তাঁরই নিকট সাহায্য চাওয়া, নৈকট্যপ্রাপ্তগণের ইস্তেগফার এটাই, তারা এক নিমেষ-কালও খোদা তা'লা হতে পৃথক হওয়াকে নিজেদের ধ্বংসের কারণ বলে জানেন। এজন্য তারা ইস্তেগফারে রত থাকেন, যেন খোদা তা'লা তাদেরকে স্বীয় প্রেম ধারায় সিক্ত করে রাখেন।

দ্বিতীয় প্রকার ইস্তেগফার হল, পাপ-বন্ধন হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে খোদা তা'লার দিকে ধাবিত হওয়া আর বৃক্ষ যেমন মাটিতে প্রোথিত হয়ে যায় তেমনি মানব অন্তর খোদার প্রেমে বিভোর হয়ে পবিত্র পরিপুষ্টি লাভ করে পাপের শুষ্কতা এবং অধঃপতন হতে রক্ষা পায়।

এই দুই প্রকারের অবস্থার নাম 'ইস্তেগফার' রাখা হয়েছে। 'ইস্তেগফার' শব্দ মূল ধাতু 'গাফ্‌র' হতে উদ্ভুত, যার অর্থ ঢেকে দেওয়া বা চাপা দেওয়া। অতএব, ইস্তেগফারের মর্মার্থ হল, যে ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহ্ তা'লার প্রেমে প্রতিষ্ঠিত করে, আল্লাহ্ তা'লা তার পাপ চেপে রাখেন এবং মানবীয় দুর্বলতার মূল নগ্ন হতে দেন না। পরন্তু ঐশী চাদরে আচ্ছাদিত করে তাকে স্বীয় পবিত্রতার আশিস দান করেন, অথবা কোন শিকড় পাপের দ্বারা নগ্ন হলে তা ঢেকে দেন এবং নগ্নতার অনিষ্ট হতে রক্ষা করেন।

যেহেতু আল্লাহ্ তা'লা কল্যাণের উৎস এবং তাঁর জ্যোতি যাবতীয় অন্ধকার দূর করার জন্য সব সময় প্রস্তুত, এজন্য পবিত্র জীবন লাভের প্রকৃত পন্থা এটা যে, এই ভয়ঙ্কর অবস্থা হতে ভীত হয়ে আমরা সেই পবিত্র উৎসের পানে উভয় হস্ত প্রসারিত করি, যেন সেই ঝর্ণা-ধারা প্রবল বেগে আমাদের দিকে ছুটে আসে এবং সমস্ত অপবিত্রতাকে একেবারে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। খোদা তা'লাকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাঁর পথে মৃত্যুকে বরণ করে স্বীয় অস্তিত্বকে তাঁর নিকট সমর্পণ করা অপেক্ষা উত্তম আর কোন কুরবানী নাই। (সিরাজুদ্দিন ঈসায়ীকে চার সোয়ালোকা জওয়াব, রূহানী খাযায়েন, ১২তম খণ্ড, পৃ: ৩৪৬-৩৪৭)

(চলবে)

ভাষান্তর: **মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ্**

স্রষ্টার নামে মানুষকে নির্বিচারে গরু-ছাগলের মত জবাই করা আর যাই হোক কোন মানুষের বিশেষ করে কোন মুসলমানের কাজ হতেই পারে না।

জঙ্গিবাদের উত্থান ও আমাদের করণীয়

মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী
মুবাল্লেগ ইনচার্জ, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

আমরা কী ধরনের ইসলাম মান্য করি তার একটি ধারনা দেয়ার জন্য আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার লেখার একটি ছোট্র অংশই তুলে ধরা যথেষ্ঠ হবে। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী (আ.) বলেছেন: "কেউ যদি তার হিন্দু প্রতিবেশীর বাড়ীতে আগুন লেগেছে দেখেও তা নেভানোর জন্য না ওঠে তাহলে আমি সত্যি সত্যিই বলছি সে আমার কেউ নয়। আমার ভক্তদের কেউ যদি কাউকে এক খ্রিস্টান বধ করতে উদ্যত দেখেও তাকে বাঁচানোর জন্য এগিয়ে না আসে তাহলে আমি তোমাদেরকে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, সে আমার দলভূক্ত নয়।" (সিরাজুম মুনীর পুস্তক, পৃষ্ঠা ২৮)

আমাদের বর্তমান খলিফা হযরত মির্যা মসরূর আহমদ, খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস(আই.) জঙ্গিবাদ দমন প্রসঙ্গে বলেছেন,

"It is the duty of Government and authorities to remain vigilant to the threat of terrorism at all times and to monitor the situation. I also think the police and authorities should be given adequate resources to stop the terrorists and extremists."

যে ধর্মের ঐশীগ্রন্থ নিজ সূচনায় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা দেয় 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' তথা সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক-প্রভু আর যে ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা স্বয়ং আল্লাহ কর্তৃক ঘোষিত 'রাহমাতুল্লিল আলামীন' (২১/১০৮) তথা 'সমস্ত জগতের জন্য মূর্তিমান কৃপা' সেই ধর্মেরসাথে জঙ্গিবাদ-সন্ত্রাসবাদের সম্পর্কটা ঠিক আলোর সাথে আধারের সম্পর্কের মত। জলে-তেলে মিশলেও মিশতে পারে কিন্তু ইসলাম ও জঙ্গিবাদ কখনও সহাবস্থান করতে পারে না। যে ধর্মের ঘোর সমালোচকরাও অকপটে এর অদম্য আত্মিক আকর্ষণের কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন, যে ধর্মের মূল শিক্ষাই হচ্ছে মনুষ্যত্ব– গুটি কয়েক উম্মাদের বিকৃত মানসিকতার কারণে সে ধর্মকে আজ জবাবদিহিতার কাঠগড়ায় আসামী হিসেবে দাঁড় করানো হচ্ছে!

এসব ভণ্ড উম্মাদরা ইসলামের জন্য কলঙ্ক। এরা ইসলামের দোহাই দিয়ে মানুষকে আহবান জানালেও ইসলামের সাথে এদের কোন মিল নেই। নিরীহ মানবহত্যা এদের সবচেয়ে প্রধান কাজ। ইসলাম বলে,'মান কাতালা নাফসাম্ বিগায়রি নাফসিন আও ফাসাদিন ফিল আরদি ফাকা'ন্নামা কাতালান নাসা জামীয়া' অর্থাৎ 'যে ব্যাক্তি নরহত্যা অথবা দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টির ঘোরতর অপরাধ ছাড়া কোন নিরীহ মানুষকে হত্যা করে সে যেন গোটা মানবজাতিকেই হত্যা করল'। 'ওয়ামান আহ্ইয়াহা ফাকা'ন্নামা আহ্ইয়ান নাসা জামীয়া' (সূরা মায়েদা: ৩৩) 'আর যে একটি প্রাণও রক্ষা করে সে যেন গোটা মানবজাতিকে নবজীবন দান করল'। অন্যায়ভাবে মানবহত্যার বিষয়ে এত স্পষ্ট সাবধানবানী থাকা সত্ত্বেও এবং

মানুষের প্রাণরক্ষার এত জোর তাগিদ থাকা সত্ত্বেও উগ্র-ধর্মান্ধরা কীভাবে ইসলামের নামে রক্তের হোলি খেলে তা ভাবতেও গা শিউরিয়ে ওঠে! লক্ষণীয় বিষয় হল, এখানে মানুষটি মুসলমান কি না তা যাচাই করার কথা বলা হয় নি। কেবল বলা হয়েছে, নিরীহ মানুষকে বধ করা গোটা মানবজাতিকে হত্যা করার সমতুল্য আর একজন মানুষকে রক্ষা করাও সমস্ত মানবজাতিকে রক্ষা করার মত পূণ্যকর্ম। এখনকার জঙ্গিবাদ অবলীলায় মানুষকে হত্যা করা শেখায়। অথচ ইসলাম মানুষকে আল্লাহর সৃষ্টির মাঝে সবচেয়ে মূল্যবান ও সম্মানিত সৃষ্টি বলে ঘোষণা করে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'লা বলেছেন, 'ওয়ালাক্বাদ্ কার্‌রামনা বনি আদামা ওয়া হামাল্‌নাহু ফিল বার্‌রি ওয়াল বাহ্‌র...' (সূরা বনি ইস্রায়িল: ৭১) অর্থাৎ, আমি আদম সন্তানদের সম্মানিত করেছি এবং জলে ও স্থলে তাকে (চলাচলের জন্য) বাহন দান করেছি। যে ক্ষেত্রে স্বয়ং স্রষ্টা মানুষকে সম্মানে ভূষিত করেছেন সেক্ষেত্রে সেই স্রষ্টার নামে মানুষকে নির্বিচারে গরু-ছাগলের মত জবাই করা আর যাই হোক কোন মানুষের বিশেষ করে কোন মুসলমানের কাজ হতেই পারে না। আল্লাহ তা'লা এ বিষয়ে আরও স্পষ্ট করে বলেছেন, 'ওয়ালা তাকতুলু নাফসাল্লাতি হার্‌রামাল্লাহু ইল্লা বিল হাক্ব' অর্থাৎ 'আর তোমরা আল্লাহ্ কর্তৃক সম্মানিত ও হারাম ঘোষিত কোন মানুষকে হত্যা করো না, তবে আইনগত ও বৈধ কারণ থাকলে তার কথা ভিন্ন' (সূরা আনআম: ১৫২)। এত স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা থাকা সত্ত্বেও এই জঙ্গিরা ইসলামের নামে কীভাবে মানুষকে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করতে সাহস পায় তা ভাবতেও অবাক লাগে! "ইহারা কলির নব ফেরাউন ভেল্কি খেলায় হারে, মানুষে ইহারা না মেরে প্রথমে মনুষ্যত্ব মারে।"

জঙ্গিবাদীদের একটি উদ্ভট যুক্তি হল, এরা অর্থাৎ পশ্চিমা জাতিগুলো আমাদের মুসলমান ভাইদের ইরাক, সিরিয়া, আফগানিস্থানে ও লিবিয়ায় হত্যা করেছে তাই আমরা এর প্রতিশোধস্বরূপ পশ্চিমাদেরকে যেখানে পাব কিসাসের বিধান অনুযায়ী হত্যা করব। গণমাধ্যমে জঙ্গিরা এ ধরনের বক্তব্যই উপস্থাপন করেছে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন! এদের এই খোঁড়া যুক্তি তর্কোচ্ছলে যদি কয়েক মুহূর্তের জন্য মেনেও নেয়া হয় তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায়, তাহলে তোমরা কেন উত্তর ইরাক ও উত্তর সিরিয়ায় আর লিবিয়ার মাটিতে মুসলমান হয়ে মুসলমান নিধন করছ? কেন তোমরা তাহলে হোলে রেস্টুরেন্টে মুসলমানদের হত্যা করলে? এর সহজ অর্থ হল এরা মুসলমানদের সাথে ভাওতাবাজী করছে। একদিকে এরা বাহ্যত মুসলমানদের সুহৃদ সাজে আবার স্বার্থের দ্বন্দ্ব হলে বা মতের অমিল হলে এরা তাৎক্ষণিক মুসলমানদেরকে অমুসলমান ঘোষণা করে তাদেরকে হত্যা করে!সাবধান, এরাই নব্য খারেজীদের দল যারা প্রকৃতপক্ষে অন্তর্যামী হবার দাবিদার! এরাই প্রাথমিক যুগে মুসলমানদের ঐশী খিলাফত ধ্বংসের কারণ হয়েছিল এখন এরাই আবার ভিন্নরূপে মুসলমানদের জন্য মহাবিপদ হয়ে দেখা দিয়েছে।

এখন তাদের উদ্ভট দাবির 'কিসাস' প্রসঙ্গ। কিসাসের বিধানটি কি? চলুন, সূরা বাকারার ১৭৯ ও ১৮০ আয়াত দু'টো ভালভাবে পড়ে নিই। আল্লাহ বলেছেন: "হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের জন্য অন্যায়ভাবে হত্যাকৃতদের বিষয়ে 'কিসাস' (বা সম পর্যায়ের শাস্তি প্রদানের) বিধান দেয়া হয়েছে। অপরাধী স্বাধীন ব্যক্তির ক্ষেত্রে সেই স্বাধীন ব্যক্তিকে, ক্রীতদাসের ক্ষেত্রে সেই ক্রীতদাসকে, নারীর ক্ষেত্রে সেই নারীকেই শাস্তি দেয়া বিধেয়। তবে যার ক্ষেত্রে তার (অর্থাৎ নিহতের) ভাইয়ের পক্ষ থেকে কিছুটা ক্ষমা করা হয় সেক্ষেত্রে যথাযথ বিধির অনুসরণ করা এবং সততার সঙ্গে তার পাওনা আদায় করা বিধেয়। এটি তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে একটি ছাড় ও দয়া বিশেষ। এরপরও যে সীমালঙ্ঘন করবে তার জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে। আর তোমাদের জন্য 'কিসাসের' বিধানে জীবন নিহিত রয়েছে যাতে তোমরা সাবধান হতে পার।" অর্থাৎ পশ্চিমারা ইরাকে সিরিয়ায় মুসলমান মেরেছে বলে আমি যে কোন ব্যাক্তিকে প্যারিসে বা নীসে বা মিউনিকে বা গুলশানে মেরে ফেলব– এর নাম 'কিসাস' নয়! এর নাম সন্ত্রাসী নৈরাজ্য তথা ফাসাদ। 'কিসাস'

হল, যে অপরাধী কেবল তাকেই বৈধ ও যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শাস্তি প্রদান করার নাম। হ্যাঁ, রক্তপণ নিয়ে প্রাণভিক্ষা দেয়া যেতে পারে,কিন্তু এর সিদ্ধান্ত দিতে পারে কেবল নিহতের মূল এবং প্রধান উত্তরাধিকারী, অন্য কেউ নয়। অতএব 'উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে'–চাপানোর নাম 'কিসাস' নয়।

জঙ্গিবাদের হোতারা কিছু পারুক বা না পারুক, সমাজে নৈরাজ্য আর বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে সিদ্ধহস্ত। আর এর মাধ্যমে তারা নাকি আল্লাহ্‌র ও রসূলের সেবা করে যাচ্ছে! অথচ আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে বার বার বলে দিয়েছেন:

'ফিতনা হত্যা অপেক্ষা গুরুতর অপরাধ।'(সূরা বাকারা: ১৯২)

'আর আল্লাহ অশান্তি পছন্দ করেন না।'(সূরা বাকারা: ২০৬)

'ফিতনা হত্যা অপেক্ষা গুরুতর অন্যায়।'(সূরা বাকারা: ২১৮)

'এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে যেও না। আল্লাহ্ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদেরকে ভালবাসেন না।' (সূরা কাসাস: ৭৮)

জঙ্গিরা আত্মহত্যার মত হারাম ও নিষিদ্ধ কাজের নাম রেখেছে মহান আত্মত্যাগ ও প্রাণ উৎসর্গীকরণ! এ কাজ করে এরা নাকি সরাসরি জান্নাতে চলে যাচ্ছে!! বিষয়টি 'কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন' রাখার মতই একটি হাস্যস্কর ব্যাপার। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'লা স্পষ্ট বলেছেন: '...ওয়ালা তাকতুলূ আনফুসাকুম ইন্নাল্লাহা কানা বিকুম রাহীমা। ওয়ামাই ইয়াফআল যালিকা উদওয়ানাও ওয়া যুলমান ফাসাওফা নুসলিহী নারা, ওয়া কানা যালিকা আলাল্লাহি ইয়াসীরা' (সূরা নিসা: ৩০-৩১)। অর্থ, '...আর তোমরা আত্মহত্যা করবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি অতিশয় দয়ালু। আর যে-ই সীমালঙ্ঘন ও অনাচারের পথ ধরে এ কাজ করবে–আমি তাকে নির্ঘাত আগুনে দগ্ধ করব। আর একাজটা আল্লাহ্‌র জন্য অতিব সহজ।' জঙ্গি মোল্লারা মগজধোলাই করে বলে আত্মহত্যা করলে জান্নাতে যাবে, আর মহান আল্লাহ বলেন, আত্মহত্যা করলে মানুষ জাহান্নামে যাবে। সুধী উপস্থিতি! বলুন দেখি, কার কথাটা ঠিক, আল্লাহর না মোল্লার?

আরও দেখুন, সহীহ হাদীসে স্পষ্ট বর্ণিত হয়েছে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ(সা.)-এর কাছে একবার এমন একজনের জানাযা বয়ে নিয়ে আসা হয় যে তীরের ফলা দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ(সা.) দয়ার সাগর হওয়া সত্ত্বেও তার জানাযা পড়ান নি (মুসলিম শরীফ, কিতাবুল জানায়েয)! যুদ্ধের মাঠে মুসলমানদের পক্ষে বীরত্বের সাথে লড়তে লড়তে এক ব্যাক্তি গুরুতর আহত হয়। শেষ পর্যন্ত ক্ষতের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে সে ব্যাক্তি যুদ্ধক্ষেত্রেই আত্মহত্যা করে। তার সম্বন্ধেও মহানবী(সা.) জাহান্নামী হবার আগাম সংবাদ দিয়েছিলেন। অতএব দেয়ার ইয্ নাথিং টু গ্লোরিফাই সুইসাইড।সরলমনা মুসলমানদের যখন এসবইসলামী শিক্ষা ভালভাবে বুঝিয়ে দেয়া হবে তখন সমাজে আত্মহত্যাকারীও তৈরী হবে না আর আত্মঘাতী বোমারুও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

প্রতিষ্ঠিত সরকার বা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ইসলাম ধর্মে একেবারে নিষেধ। অথচ এ কাজটিই অবলীলায় করে যাচ্ছে জঙ্গিবাদীরা! বিদ্রোহ করতে নিষেধ করে আল্লাহ তা'লা বলেছেন: 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ন্যায়সূলভ, অনুগ্রহসূলভ ও আত্মীয়সূলভ আচরণ করার নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন যাবতীয় অশ্লীলতা ও অসৎকর্ম সাধন এবং বিদ্রোহ করতে ('বাগি' শব্দের অর্থ বিদ্রোহ); তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর' (সূরা নহল: ৯০)। মহানবী (সা.) শত কষ্ট সহ্য করেও মক্কা নগরীতে নবুওতের ১৩টি বছর অবস্থান করেন, কিন্তু তিনি কখনও প্রতিষ্ঠিত সরকার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন নি। যখন মক্কাবাসীদের অত্যাচার-অনাচার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল তখনও তিনি কোন ধরনের বিদ্রোহ না করে নীরবে মদীনায় হিজরত করেন। মদীনায় গিয়ে একটি নগররাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার পর তিনি যে আইনটি ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন তা ছিল, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যেন কেউ কখনও বিদ্রোহ না করে। সর্বাবস্থায় প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার আনুগত্য করতে শিখিয়েছেন তিনি (সা.)। একবার এক সাহাবী "হজরত সালামা ব. ইয়যিদ জু'ফী (রা.) মহানবী (সা.)-কে নিবেদন করলেন, 'হে আল্লাহ্‌র নবী! আমাদের ওপর যদি এমন সব শাসক ক্ষমতা লাভ করে যারা আমাদের কাছে তাদের প্রাপ্য অধিকার ঠিকই দাবী করে কিন্তু আমাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত রাখে- সেক্ষেত্রে আমাদের জন্য আপনার নির্দেশ কি?' একথা শুনে মহানবী (সা.) উত্তর দেয়ার বিষয়টি এড়িয়ে গেলেন। প্রশ্নকারী আবার দ্বিতীয় বা তৃতীয়বার প্রশ্ন করলেন। এ সময় আশআস ব. কায়স (রা.) তাকে পেছন থেকে টানতে আরম্ভ করেন {তিনি যেন নবীজি (সা.)-কে প্রশ্ন করে আর বিরক্ত না করেন}। তখন নবীজি (সা.) বলেন, 'তবুও তোমরা তাদের কথা শুনবে আর মান্য করবে। কেননা, তাদের জবাবদিহিতার দায়িত্ব তাদের স্কন্ধে আর তোমাদের দায়িত্ব তোমাদের স্কন্ধে'।" (মুসলিম শরীফ, কিতাবুল ইমারাহ)।

উগ্র-সন্ত্রাসী জঙ্গিবাদীদের দমন করতে চারটি কাজ করণীয়। ১. তাদের নেতা-কর্মীদের ওপর কড়া নজরদারি ২. তাদের অর্থের সব উৎস বন্ধ করা ৩. তাদের অস্ত্রের সরবরাহ একেবারে বন্ধ করা এবং ৪. তাদের বিকৃত মতবাদ আর ইসলামের অপব্যাখ্যা ইসলামের মূল উৎস থেকে তুলে ধরে এদেরকে জনবিচ্ছিন্ন করে দেয়া। প্রথম তিনটি কাজ সরকার ও প্রশাসনের। চতুর্থ কাজটি সমাজের। আদর্শিক যুদ্ধে জয়লাভ করার জন্য পবিত্র কুরআন, মহানবী (সা.)-এর পবিত্র জীবনাচরণ ও সঠিক ও নির্ভুল হাদীসগুলো বার বার জনসমুক্ষে তুলে ধরা একান্ত প্রয়োজন। আজ এ অনুষ্ঠানে এর একটি ঝলকই তুলা সম্ভব ছিল। আশা করি উপস্থিত সুধীবৃন্দ এ আলোচনা অব্যহত রাখবেন এবং সমাজে খাঁটি ইসলামের শিক্ষা ছড়িয়ে দেবেন। অনেকের কাছে ধর্মীয় আঙ্গিকে বিষয়টির নিরসন পছন্দ নাও হতে পারে। কিন্তু নির্মম বাস্তবতা হল, জঙ্গিবাদ নামক ইবোলা ভাইরাসের খপ্পর থেকে সমাজ ও দেশকে রক্ষা করতে সবচেয়ে প্রথমে নিজেদের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে হবে। এরপর তা ছড়িয়ে দিতে হবে সমাজের প্রতিটি স্তরে। তাই ধর্মের সঠিক শিক্ষা নিজেদের এবং নিজেদের পরিবারকে শেখাতে হবে সবার আগে। মহান আল্লাহ আপনাদের সবার মঙ্গল করুন। আমীন।

(গত ২৩শে জুলাই ২০১৬, ব্রাক সেন্টারে আহমদীয়া মুসলিম জামাত কর্তৃক আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠকে পঠিত)

জঙ্গীবাদের উত্থানের প্রেক্ষিতে নাগরিক সমাজের করণীয় মতবিবিনয় সভায় পঠিত ধারণাপত্র

২৩ জুলাই, ২০১৬, ঢাকা

উপস্থিত সম্মানিত সুধীমন্ডলী এবং ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার প্রতিনিধিবৃন্দ!

আসসালামু আলাইকুম।

আজ এক বিশেষ ক্রান্তিকালে আমরা আপনাদের এই মতবিনিময় সভায় আমন্ত্রণ জানিয়েছি। আমাদের আহ্বানে সাড়া দেয়ায় আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আমরা সবাই অবগত আছি যে, বেশ কিছুকাল থেকে আমাদের দেশে পবিত্র ও শান্তির ধর্ম ইসলামের নামে মানুষের ওপর আক্রমণ ও হত্যাযজ্ঞ চলানো হচ্ছে। কখনো এই আক্রমণ কোন ধর্মীয় গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের ওপর, কখনো বা ভিনদেশী নাগরিকের ওপর আবার কখনো বা অন্য কোন মতাদর্শের অনুসারীর ওপর। যখন, যেভাবে বা যেকারণে আর যার ওপরই এই আঘাত বা হত্যা করা হোক না কেন, তা কখনোই ইসলামের শিক্ষা হতে পারে না, বরং এসবই ইসলামের শিক্ষার সম্পূর্ণ বিরোধী কাজ। ভিন্ন মত ও ভিন্ন পথের অনুসরণকারীকে হত্যা এমনকি কোনরূপ নির্যাতন পৌঁছানোর কাজকেও ইসলাম সমর্থন দেয় না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক বলেন, "কেউ যদি কোন ব্যাক্তিকে হত্যা করে, তাহলে সে যেন গোটা মানব জাতিকে হত্যা করলো "(সূরা আল-মায়েদা ৩২ আয়াত)। মানুষের মধ্যে মতের ও বিশ্বাসের ভিন্নতা প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "আর যদি তোমার প্রভু প্রতিপালক চাইতেন তাহলে সমগ্র মানবজাতিকে একটি মাত্র সম্প্রদায়ে পরিণত করতে পারতেন, কিন্তু (তিনি অন্যরূপ বিচার করলেন) যেজন্য তারা বিভিন্ন মতের অনুসারী হলো" (সূরা হুদ ১১৮ আয়াত)। অন্যত্র আল্লাহপাক বলেন, "আর তোমার প্রভু-প্রতিপালক যদি চাইতেন তাহলে পৃথিবীতে যারা আছে তারা সবাই অবশ্যই এক সাথে ঈমান নিয়ে আসতো। তুমি কি তবে বল প্রয়োগে লোকদেরকে মু'মিন হতে বাধ্য করতে পার? আর আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন ব্যক্তির পক্ষে ঈমান আনা সম্ভব নয়। আর যারা বিবেকবুদ্ধি খাটায় না (তাদের অন্তরের) কালিমা তিনি তাদের (মুখমন্ডলে) লেপন করে দেন" (সূরা ইউনুস ৯৯-১০০ আয়াত)। এধরণের আরো অনেক সুন্দর সুন্দর শিক্ষা আমরা পবিত্র কুরআন ও মহানবী (সা.)-এর জীবনীতে দেখতে পাই যা একথাই প্রমাণ করে যে, ইসলাম কোন ভাবেই বলপ্রয়োগ, নির্যাতন ও নির্বিচার মানুষ হত্যাকে সমর্থন করে না।

কিন্তু আজ অত্যন্ত পরিতাপের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, আমাদের দেশে এবং নিকটবর্তী ও দূরবর্তী দেশ সমূহে একশ্রেণীর মুসলমান নামধারী ব্যাক্তি বা গোষ্ঠী তা যে নামেই বা যে পরিচয়েই হোক না কেন পবিত্র ধর্ম ইসলামকে ব্যবহার করে মানব সমাজে বিশৃংখলা ও নৈরাজ্য সৃষ্টির প্রয়াস চালাচ্ছে, নিরীহ, নিরপরাধ লোকের রক্তে হোলি খেলছে।

উপস্থিত সন্মানিত সূধী ও মিডিয়ার প্রতিনিধিবর্গ!

পবিত্র ও শান্তির ধর্ম ইসলামের নামে মানুষের ওপর আক্রমণ ও হত্যাযজ্ঞ চলানো হচ্ছে। কখনো এই আক্রমণ কোন ধর্মীয় গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের ওপর, কখনো বা ভিনদেশী নাগরিকের ওপর আবার কখনো বা অন্য কোন মতাদর্শের অনুসারীর ওপর। যখন, যেভাবে বা যেকারণে আর যার ওপরই এই আঘাত বা হত্যা করা হোক না কেন, তা কখনোই ইসলামের শিক্ষা হতে পারে না।

জঙ্গী বা জঙ্গীবাদ শব্দটি বাংলায় নতুন না হলেও এর উত্থান আমাদের দেশে নতুন। মাত্র কিছুকাল আগেও আমরা কল্পনাও করিনি যে, আমাদের দেশে এধরণের পরিস্থিতির উদ্ভব হবে! শুরুতে এধরণের কাজের সাথে বিশেষ শ্রেণীর এবং মূলতঃ অল্পশিক্ষিত এবং বিপথগামী মাদ্রাসা পড়ুয়া লোকদের সম্পৃক্ততার প্রমাণ পাওয়া গেলেও সাম্প্রতিক কালে সমাজের উচ্চবিত্ত এবং ইংরেজী মাধ্যম পড়ুয়া শিক্ষিত কিশোর-তরুণদের সম্পৃক্ততা আমাদের নতুন করে ভাবিয়ে তুলেছে। কি ভাবে মাত্র কয়েক মাসে একটি কোমলমতি তরুণকে সহিংস ও নিষ্ঠুর করে তোলা হচ্ছে! পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ এবং নানারূপ অনুসন্ধান ও বিশ্লেষন থেকে যা বেরিয়ে আসছে তা রীতিমত আতঙ্কজনক!

সাম্প্রতিক ঘটনাবলীতে গোটা জাতি আজ স্তম্ভিত, শোকাহত, শঙ্কিত! এহেন উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে সমজের বিবেকবান, দায়িত্বশীল ও শান্তিপ্রিয় নাগরিক হিসেবে আমরাও চুপ করে বসে থাকতে পারি না। আমরা আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্যগণ যদিও বিভিন্ন সময়ে নানা আক্রমণ ও নির্যাতনের শিকার হয়েছি এবং বিশেষ করে ১৯৯৯ সালের ৮ অক্টোবর জুমুআর খুতবা চলাকালে খুলনার আহমদীয়া মসজিদে রিমোট কন্ট্রোল অথবা টাইম বোমার বিষ্ফরণ ঘটিয়ে ৭ জনকে হত্যা এবং গত ২৫ ডিসেম্বর, ২০১৫ সালে আবারো জুমুআর নামাজের সময় রাজশাহীর বাগমারাস্থ আহমদীয়া মসজিদে আত্মঘাতী বোমা বিষ্ফোরণ ঘটিয়ে ৩ জন মুসল্লীকে আহত করা হয়, তথাপি আজ আমরা কেবল আমাদের নিজেদের নিরাপত্তার জন্য নয়, বরং গোটা বাংলাদেশের সমাজের নিরাপত্তার জন্য উদ্বিগ্ন, বিশ্ব শান্তির জন্য উদ্বিগ্ন। আমরা মনে করি এদেশ ও এ সমাজের নাগরিক বা সদস্য হিসেবে এটা আমাদের পবিত্র দায়িত্ব যে, সমাজের এই ক্রান্তিকালে সবার সাথে আমরাও আমাদের সামর্থ নিয়ে এগিয়ে আসি।

প্রিয় সূধী ও মিডিয়ার প্রতিনিধিবৃন্দ!

বাংলাদেশের সংখ্যানুপাতে আমরা একটি অতি ক্ষুদ্র সম্প্রদায়। কিন্তু আমরা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন নই। আমরা আপনাদের অর্থাৎ বৃহত্তর সমাজেরই একটি অংশ। আপনাদের মাঝেই রয়েছেন আমাদের আত্মীয় পরিজন, ভাই বন্ধু। আমাদের বিপদে সর্বদা আমরা আপনাদের পাশে পেয়েছি, এই বৃহত্তর সমাজের সাহায্য ও সহয়তা পেয়েছি, ভালোবাসা পেয়েছি, সেকথা আমরা সর্বদা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি। তাই সমাজ তথা জাতির এই ক্রান্তিকালে আমরা একত্রে কাজ করতে চাই। বাহ্যত আমাদের কোন ধন নেই, সম্পদ নেই। কিন্তু আমাদের রয়েছে পবিত্র কুরআন, সুন্নাহ (অর্থাৎ মহানবীর সা.-এর জীবনাদর্শ) এবং তাঁর হাদিসের মত মহামূল্যবান সম্পদ। এই দিয়ে আমরা সমাজকে সাহায্য করতে চাই। ইসলামের নামে জঙ্গীবাদ ও উগ্রবাদের প্রচার ও প্রসারের বিপরীতে আমরা এর সঠিক শিক্ষা তুলে ধরতে চাই। (আহমদীয়া মতবাদ প্রচার আমাদের উদ্দেশ্য নয়)।

এখানে একটি বিষয় আপনাদের অবগতির জন্য জানাতে চাই যে, বিশ্বব্যাপী ইসলামের নামে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের উত্থানের প্রেক্ষিতে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান খলিফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ পদক্ষেপের আহ্বান জানিয়ে আসছেন। বিগত কয়েক বছরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে "শান্তি সম্মেলন", বিশ্ব নেতৃবৃন্দের কাছে পত্র প্রেরণ এবং যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাপিটল হিল, যুক্তরাজ্য ও ইউরোপীয় পার্লামেন্ট, জাপান, সুইডেন, জার্মানী, সুইজারল্যান্ড সহ বিভিন্ন দেশে গুরুত্বপূর্ণ সমাবেশে ইসলামের সঠিক ও শান্তিপূর্ণ শিক্ষা তুলে ধরে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়ে আসছেন। প্রসঙ্গতঃ এও উল্লেখ্য যে আহমদীয়া খিলাফত কোন রাজনৈতিক বা জাগতিক খিলাফত নয় এবং ১৯০৮ সাল থেকে এই খিলাফত জারি রয়েছে, বর্তমান খলিফা এই ধারাবাহিকতার ৫ম খলিফা। ২০১৪ সালে যুক্তরাজ্যে অনুষ্ঠিত শান্তি সম্মেলনে তিনিই প্রথম আই এস বা আইসিসএর অর্থ এবং অস্ত্রের উৎস সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন।

সাম্প্রতিক সময়ে আমাদের দেশে বিভিন্ন আলাপ-আলোচনা ও টকশোতে এবিষয়গুলোই উঠে আসছে যে, অপব্যাখ্যার বিপরীতে ইসলামের প্রকৃত ও শান্তির শিক্ষা মানুষের সামনে তুলে ধরতে হবে। নানা ভ্রান্ত ও বিকৃত দর্শনের মাধ্যমে আমাদের কোমলমতি তরুণ সমাজকে বিভ্রান্ত করার যে একটি প্রয়াস চালানো হচ্ছে তা থেকে তাদের রক্ষা করতে হবে। বিশেষ করে পরিবার থেকে শুরু করে সমাজ এবং শিক্ষাব্যবস্থা ও কারিকুলামে মানবতা, উদারতা, পরমত সহিষ্ণুতার শিক্ষা দিতে হবে। সন্তানের সাথে পিতা-মাতার ঘনিষ্টতা বাড়াতে হবে, তাদের সময় দিতে হবে।

আমাদের বিশ্বাস ও আকাঙ্ক্ষা এই যে, আজকের এই মতবিনিময়ের মাধ্যমে আমরা সম্মিলিতভাবে সমাজকে একটি দিক নির্দেশনা দিতে অথবা ন্যুনতম পক্ষে এই সঙ্কট থেকে উত্তরণের ক্ষেত্রে কিছুটা আলোর দিশা দিতে সক্ষম হবো, আর তবেই আমাদের এই আয়োজন সার্থক হবে।

আমাদের আমন্ত্রণে সাড়া দেয়ার জন্য আবারো আপনাদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আপনাদের সবাইকে আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

আহমদ তবশির চৌধুরী
বহিঃসম্পর্ক ও গণ-সংযোগ সম্পাদক
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের উদ্যোগে "জঙ্গীবাদের উত্থানে নাগরিক সমাজের করণীয়" বিষয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

২৩ জুলাই, ২০১৬, রোজ শনিবার অপরাহ্নে রাজধানীর ব্র্যাক সেন্টার ইন-এ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত "জঙ্গীবাদের উত্থানে নাগরিক সমাজের করণীয়" বিষয়ক এক মতবিনিময় সভায় বক্তাগণ জঙ্গীবাদের বিকৃত মতবাদের বিপরীতে ইসলামের সঠিক শিক্ষা তুলে ধরতে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

সভার শুরুতে ধারণা পত্র উপস্থাপন করেন আহমদীয়া জামা'তের বহিঃসম্পর্ক ও গণ-সংযোগ সম্পাদক আহমদ তবশির চৌধুরী। সাম্প্রতিক জঙ্গী আক্রমণের প্রেক্ষিতে উদ্ভুত পরিস্থিতির উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, শান্তির ধর্ম ইসলামের নামে পরিচালিত এহেন নৃশংস ও ইসলাম বিরোধী কাজে সমগ্র জাতির সাথে আমরাও শোকাহত এবং স্তম্ভিত! তিনি বলেন, ভিন্ন মত ও ভিন্ন পথের অনুসারীকে হত্যা এমনকি কোনরূপ নির্যাতন করাও ইসলাম অনুমতি দেয় না। শান্তির ধর্ম ইসলামের নামে নানা ভ্রান্ত ও বিকৃত দর্শনের মাধ্যমে আমাদের কোমলমতি তরুণ সমাজকে বিভ্রান্ত করে জঙ্গী বানানোর এই অপপ্রয়াস সম্মিলিত ভাবে রুখতে হবে। তিনি বলেন, জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে শান্তিপ্রিয় ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসাবে একান্ত বিবেকের তাগিদেই আমরা বৃহত্তর সমাজের সাথে ঐক্যবদ্ধ ভাবে এই সমাস্যার সমাধানে কাজ করতে চাই।

বিগত কয়েক বছর যাবত শান্তির সপক্ষে বিশ্বব্যাপী আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের নানা উদ্যোগের কথা উল্লেখ করে আহমদ তবশির চৌধুরী বলেন, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান খলিফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ বিগত কয়েক বছরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে "শান্তি সম্মেলন", বিশ্ব নেতৃবৃন্দের কাছে পত্র প্রেরণ এবং যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাপিটল হিল, যুক্তরাজ্য ও ইউরোপীয় পার্লামেন্ট, জাপান, সুইডেন, জার্মানী, সুইজারল্যান্ড সহ বিভিন্ন দেশে গুরুত্বপূর্ণ সমাবেশে ইসলামের সঠিক ও শান্তিপূর্ণ শিক্ষা তুলে ধরে বিশ্বশান্তি শান্তি প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়ে আসছেন।

সভায় প্রধান অতিথি তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু বলেন যে, দেশ এখন যুদ্ধাবস্থায় আছে, এই যুদ্ধ জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে শান্তির, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের। তিনি বলেন, আজ এদেশে ইসলামের আটশ বছরের শান্তির ঐতিহ্য আর তিন হাজার বছরের সভ্যতাকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র চলছে, এই যুদ্ধে আমাদের বিজয়ী হতে হবে। তিনি বলেন, জঙ্গীবাদ শান্তি, সম্প্রীতি আর সভ্যতার শত্রু।

বিশিষ্ট গবেষক ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক মেসবাহ কামাল বলেন, আরো আগেই জঙ্গীবাদকে দমনের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া উচিত ছিল, তাহলে আজ এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হতো না। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, জঙ্গীবাদ বিরোধী সরকারের বর্তমান অবস্থান সঠিক পথে পরিচালিত হবে।

লেখক-সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির বলেন, জঙ্গীবাদের মূলে রয়েছে মৌদুদীবাদী দর্শন ও এর সমগোত্রীয় মুসলিম ব্রাদারহুডসহ

অন্যান্য উগ্রপন্থী দর্শনগুলো। তিনি মাদ্রাসা শিক্ষাসহ সার্বিক শিক্ষা ব্যাবস্থার সংস্কার এবং তাতে দেশীয় ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ সংযোজনের আহ্বান জানান। তিনি ধর্মে নামে রাজনীতি বন্ধ ও ১৯৭২ এর সংবিধানের পরিপূর্ণ পুণপ্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী তার বক্তব্যে, পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শ থেকে বিভিন্ন উদ্ধৃতি তুলে ধরে বলেন যে, ইসলাম কোন অবস্থায়ই উগ্রবাদকে সমর্থন দেয় না। তিনি বলেন ইসলাম কেবল যুদ্ধাবস্থায় আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্রধারনের অনুমতি প্রদান করে। তিনি বলেন, মহনবী (সা.) রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সৃষ্টির অপরাধে মৃত্যুদন্ডের শাস্তি দিয়েছিলেন, ধর্মদ্রোহিতার জন্য নয়। তিনি বলেন "আত্মঘাতি" শব্দটি ইসলাম বিরোধী, ইসলামে আত্মহত্যা মহা পাপ, মহানবী (সা.) দয়ার সাগর হওয়া সত্ত্বেয় আত্মহত্যাকারীর জানাযা পড়েন নি। পবিত্র কুরআন সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির বিরুদ্ধে কঠোর নিষেধাজ্ঞা প্রদান করেছে। তিনি বলেন, জঙ্গীবাদ নির্মূলে তৃণমূল পর্যায় থেকে ইসলামের সঠিক ও শান্তির শিক্ষা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। জঙ্গীবাদ দমনে তিনি চারটি করণীয় বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন, এগুলি হলো: (১) নেতাকর্মীদের ওপর নজরদারী বৃদ্ধি করা, (২) ওদের আয়ের উৎস বন্ধ করা, (৩) অস্ত্রের উৎস ও সরবরাহ বন্ধ করা এবং (৪) এবং জঙ্গী মতবাদের বিপরীতে ইসলামের সঠিক শিক্ষা তুলে ধরা। তিনি বলেন, প্রথম তিনটি কাজ সরকার ও প্রশাসনের আর শেষটি সমাজের।

নিরাপত্তা বিশ্লেষক মে. জে. (অব.) আব্দুর রশিদ জঙ্গীবাদ ঠেকাতে এর উৎসের সন্ধান এবং শিক্ষক, কোচিং সেন্টারসহ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নজরদারী বাড়ানো এবং সন্তানদের সুস্থভাবে বেড়ে ওঠার সুযোগ সৃষ্টি এবং আইনের সংস্কারের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর সৈয়দ আনোয়ার হোসেন বলেন, নাগরিক সমাজের কিছুটা সীমাবদ্ধতা রয়েছে, তারা কেবল সুপারিশ করতে পারে, কিন্তু বাস্তবায়ন সরকারের কাজ। তিনি বলেন, রোগের লক্ষণ ও চিকিৎসার কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু কারণ দেখা হচ্ছে না।

সমাপনী মন্তব্যে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ন্যাশন্যাল আমীর মোবাশশের উর রহমান বলেন, আজ থেকে একশ সাতাশ বছর আগে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) এযুগে ধর্মের নামে অস্ত্রের জিহাদ নিষিদ্ধ গোষণা করে তার স্থলে কলমের জিহাদের ঘোষণা দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আল্লাহ সৃষ্ট আলো, বায়ু, বাতাস, পানি ইত্যাদি যেমন ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-মত নির্বিশেষে সবাইকেই সেবা প্রদান করে তেমনি আমাদেরও নীতি হলো সবার প্রতি সমান আচরণ করা। জনাব মোবাশশের উর রহমান হেট ক্যাম্পেইন বা সাম্প্রদায়িক ঘৃণা ছাড়ানোর পথ বন্ধ করে ইসলামের সঠিক শিক্ষা তুলে ধরে সমাজে সম্প্রীতি স্থাপনের আহবান জানান।

মতবিনিময়ে আরো অংশ নেন, লেখক-গবেষক মহিউদ্দিন আহমদ, গণজাগারণ মঞ্চের প্রতিনিধি মারুফ রসুল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্বধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রধান ফাদার তপন ডি রোজারিও, আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহার, ঢাকার প্রতিনিধি সুনন্দপ্রিয় ভিক্ষু, বাংলাদেশ মাইনোরিটি ওয়াচ-এর এডভোকেট রবিন্দ্র ঘোষ, প্রাক্তন সচিব ও কালিমিষ্ট মহিউদ্দিন আহমদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ডঃ জিনাত হুদা প্রমূখ।

সভার সংবাদ দেশের বিভিন্ন বেসরকারী টিভি চ্যানেলে প্রচার করা হয় এবং জাতীয় প্রায় সব পত্রিকায় সচিত্র সংবাদ প্রকাশ হয়।

দৃষ্টি আকর্ষণ

অত্যন্ত আনন্দের সাথে আপনাদেরকে জানাচ্ছি যে, হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর পত্রাবলী সম্বলীত **"মাকতুবাতে আহমদ"** বর্তমানে ঢাকা কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে। বইটির সর্বমোট ০৪টি (চার) অধ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।

আপনারা জানেন যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর জীবনের প্রারম্ভিক কাল (১৮৭৮ ইং) থেকেই ইসলামের সমর্থনে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় চিঠি লিখতেন। পরবর্তীতে তাঁর এ কার্যক্রম আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি বিভিন্ন গন্য-মান্য ব্যক্তিদের নিকট চিঠি-পত্র লেখা শুরু করেন। এই চিঠি-পত্রের সংখ্যা তাঁর (আ.) ভাষ্যনুযায়ী ৯০ হাজারেরও বেশী।

১.প্রথম খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে তিনি পন্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতি, লেখরাম, শিব নারায়ণসহ আর্য ও ব্রাহ্ম সমাজি ও অন্যান্য হিন্দুদের বিখ্যাত ধর্মীয় নেতাদের নামে চিঠি লিখেন যা আমরা ইতোমধ্যে প্রকাশ করেছি, আলহামদুলিল্লাহ্।

২.প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনি আথম, ফতেহ্ মসীহ্, আমেরিকার আলেকজান্ডার ডুই ও ইংল্যান্ডের পিগেটসহ অন্যান্য বিখ্যাত খ্রিষ্টান নেতৃস্থানীয় পাদ্রীদের নামে চিঠি লিখেন। এটিও আমরা আল্লাহ্ তা'লার অশেষ ফযলে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করেছি, আলহামদুলিল্লাহ্।

৩. অতঃপর **দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম অধ্যায়** প্রকাশ করেছি যা তিনি (আ.) হযরত মওলানা হাকীম নূরুদ্দীন, খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.)-এর নামে লিখেন।

৪. অতি সম্প্রতি আমরা **প্রথম খণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়** প্রকাশ করেছি যা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) মৌলবী মুহাম্মদ হুসাইন বাটালবীর নামে লিখেন।

অনুবাদের দুরূহ কাজটি সমাধা করেছেন **মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ** সাহেব, মুরুব্বী সিলসিলা (অব.)।

সুধীবর! প্রতিটি বইয়ের প্রচ্ছদ একই রকম হওয়াতে আপনাদের বুঝতে অসুবিধা হতে পারে। ক্রয়ের সময় দেখে কিনবেন।

প্রয়োজনে: ০১৯১২-৭২৪৭৬৯।

সংবাদ

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

মজলিস আনসারুল্লাহ্ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আয়োজনে গত ৩০/০৪/২০১৬ রোজ শনিবার, বাদ মাগরিব মৌড়াইল হালকায় নামায সেন্টারে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় যয়ীমে আলার উপস্থাপনায় এই জলসায় সভাপতিত্ব করেন জনাব মোশারফ হোসেন, রিজিওনাল নাযেম, মজলিস আনসারুল্লাহ্ ব্রাহ্মণবাড়িয়া-সিলেট রিজিওন। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে জলসার কার্যক্রম শুরু হয়। তেলাওয়াত করেন জনাব মোস্তাক আহমদ ভূঁইয়া। নযম পাঠ করেন জনাব সৈয়দ জসিম আহমদ। বক্তৃতাপর্বে 'হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর রসূল (সা.) প্রেম' প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখের মৌলবী এস. এম. আবু তাহের। 'নারী জাতির প্রতি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উত্তম আচরণ' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা জহির উদ্দিন আহমদ। 'হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মানব প্রেম' বিষয়ে আলোকপাত করেন জনাব মোস্তাক আহমদ খন্দকার। 'হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর তৌহিদ প্রচার' প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ মঞ্জুর হোসেন। সভাপতির সংক্ষিপ্ত ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে জলসার কার্যক্রম শেষ হয়। এতে ৭২ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ আবু তালেব

লাজনা ইমাইল্লাহ নূরনগর-ইশ্বরদীতে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ২৬/০৬/২০১৬ রোজ রবিবার নূরনগর-ইশ্বরদীর উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন লাজনা প্রেসিডেন্ট রওশনয়ারা। কুরআন তেলাওয়াত করেন পাপীয়া খাতুন, নযম পাঠ করেন ফাল্গুনী। এতে মহানবী (সা.)-এর উত্তম আদর্শ নিয়ে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করেন লাজলী জামান, পাপিয়া, দীপা এবং রুনা। সবশেষে সভানেত্রীর বক্তব্য ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। এতে ১৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

রওশনয়ারা

মজলিস আনসারুল্লাহ্ মহারাজপুরের উদ্যোগে ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত

মহারাজপুর মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র উদ্যোগে গত ১০ জুলাই রবিবার বাদ মাগরিব মহারাজপুর আহমদীয়া মসজিদে এক ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান স্থানীয় যয়ীম গাজী মোহাম্মদ মনসুর আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে কুরআন তেলাওয়াত করেন জালাল আহমদ সরদার। বিভিন্ন বিষয় তরবিয়তী বক্তব্য রাখেন কাফুরিয়া জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব জালাল আহমদ সরদার, সাবেক যয়ীম জনাব নজরুল ইসলাম, আড়ানি হালকা প্রেসিডেন্ট জনাব লোকমান আলী এবং বিষ্ণপুর মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র যয়ীম জনাব আমীর মাহমুদ ভুঁইয়া। পরে সভাপতির সমপনী ভাষণ এবং দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

গাজী মোহাম্মদ মনসুর আহমদ

লাজনা ইমাইল্লাহ্ রংপুরের উদ্যোগে বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

লাজনা ইমাইল্লাহ্ রংপুরের উদ্যোগে গত ০৩/০৬/২০১৬ বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। এতে কুরআন তেলাওয়াত করেন রেজওয়ানা রশিদ। লাজনা ইমাইল্লাহর স্থানীয় প্রেসিডেন্ট এর দোয়ার মাধ্যমে অধিবেশন শুরু হয়। নযম পাঠ করেন জ্যোস্না বশির। তারপর কেন্দ্রীয় সিলেবাস অনুযায়ী বিভিন্ন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ইজতেমায় পর্দার গুরুত্ব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন আনোয়ারা বেগম। পুরস্কার বিতরনী, সমাপনী ভাষণ এবং দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমা সমাপ্ত হয়। এতে ৮২ জন উপস্থিত ছিলেন।

দিলরুবা জামান মুক্তা

লাজনা ইমাইল্লাহ রঘুনাথপুর বাগের ৫ম ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ৫-৮-১৬ শুক্রবার লাজনা ইমাইল্লাহ রঘুনাথপুরবাগের উদ্যোগে স্থানীয় জামে মসজিদে সকাল ৯টায় শুরু হয় ৫ম বার্ষিক ইজতেমা। এতে সভানেত্রী ছিলেন আয়েশা আতিয়ার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুফাত্তিস ফাতেমা আহমদ। শুরুতেই কুরআন তেলাওয়াত করেন রিপা মাহমুদ। দোয়া পরিচালনা করেন সভানেত্রী। নযম পাঠ করেন সুরাইয়া ইসলাম নদী। পর্দার আড়াল থেকে নসীহতমূলক বক্তব্য রাখেন মৌ. এস. এম মাহমুদুল হক। বয়আতের দশ শর্তের ওপর আলোকপাত করেন ফাতেমা আহমদ। দোয়া ও পুরস্কার বিতরণের মাধ্যমে ইজতেমার কার্যক্রম সমাপ্ত হয়। এতে ৬০ জন উপস্থিত ছিলেন।

নাজমা ইসলাম

তেজগাঁও জামা'তে তরবিয়তী অধিবেশন অনুষ্ঠিত

গত ২৯/০৭/২০১৬ তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ স্থানীয় জামে মসজিদে তরবিয়তী অধিশেন অত্যন্ত সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভপতিত্ব করেন জনাব মোহাম্মদ আব্দুল করীম, প্রেসিডেন্ট, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, তেজগাঁও। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মোহাম্মদ মাকসুদ উল হক। হুযূরের খুতবার আলোকে নিজেদের জীবন পরিচালনার বিষয়ে বক্তব্য রাখেন ভাইসপ্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ বোরহানুল হক। সভাপতির নসীহত মূলক বক্তব্য ও দোয়ার মাধ্যমে তরবিয়তী অধিবেশনের সমাপ্তি ঘটে। এতে প্রায় ৪৫জন উপস্থিত ছিলেন।

সৈয়দ মোহাম্মদ মহিদুল ইসলাম

রমযান ও ঈদুল ফিতর উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচী পরিচালনা

আহমদীয়া মুসলিম জামাত ব্রাহ্মণবাড়িয়া কর্তৃক রমযান উপলক্ষ্যে মাসব্যাপী বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। যার মধ্যে ছিল হালকাগুলোতে তারাবী নামাযের ব্যবস্থা, দরসে কুরআন, ইফতারীর ব্যবস্থা, কুরআন ক্লাসের ব্যবস্থা, জামাতের ২০৫ জন সদস্য/সদস্যা কর্তৃক পবিত্র কুরআন খতম করা এবং ২টি মসজিদে ১৫ জন সদস্যের রমজান শেষে ১০ দিন ইতেকাফ করা। এছাড়া ঈদের নামাযের পর জামাতের ও অংগ সংগঠনের মসলিস আমেলা সমন্বয়ে গঠিত ৭টি টিম ৪টি হালকার প্রায় ২৬১ টি বাড়ী বাড়ী গিয়ে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় এবং শিশুদের মাঝে চকলেট বিতরন করা হয়। এ কাজে ৩৫ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন। শেষে মরহুম সৈয়দ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের মাজার জিয়ারত করে ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে দিনব্যাপী ঈদের কর্মসূচীর সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোস্তাক আহমদ খন্দকার

জামালপুর হবিগঞ্জে ওসীয়্যত সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গত ০৯-০৬-২০১৬ জামালপুর হবিগঞ্জে ওসীয়্যত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জনাব শামসুর রহমান চৌধুরী, প্রেসিডেন্ট, জামালপুর, হবিগঞ্জ। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব শফিক আহমদ চৌধুরী। উর্দু নযম পরিবেশন করেন জনাব খালিক আহমদ চৌধুরী। এতে ওসীয়্যতের গুরুত্ব তুলে ধরে পর্যায়ক্রমে বক্তব্য রাখেন মৌলবী হুমায়ুন কবির, জনাব আজিজুর রহমান চৌধুরী, জনাব সাব্বির আহমদ চৌধুরী এবং জনাব তৌফিক আহমদ চৌধুরী। এতে নযম পাঠ করেন জনাব কুদ্দুস আহমদ চৌধুরী ও জনাব জনি আহমদ চৌধুরী। সবশেষে সভাপতি ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনার নেয়ামত ও কল্যাণ এর ওপর তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা করেন। এতে ৫৮ জন উপস্থিত ছিলেন।

শামসুর রহমান চৌধুরী

লাজনা ইমাইল্লাহ্ ফাজিলপুর

গত ০৩/০৬/২০১৬ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ লাজনা ইমাইল্লাহ্ ফাজিলপুরের উদ্যোগে খিলাফত দিবস পালন করা হয়। এতে কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠ করেন যথাক্রমে মিসেস আমাতুল মজিদ ও সাবিহা আক্তার তমা। এরপর ঐশী খিলাফতের কল্যাণ ও আহমদীয়া খিলাফত বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন যথাক্রমে আমাতুর মতিন ও আমাতুল মজিদ। এরপর সভাপতির বক্তব্য প্রদান করেন স্থানীয় লাজনা প্রেসিডেন্ট মিসেস মোস্তারিনা আকতার। দোয়ার মাধ্যমে দিবসের সমাপ্তি হয়। এতে ১৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

আমাতুল মজীদ

সিলেট জামা'তে ঈদ পুনর্মিলনী

গত ১৫ জুলাই ২০১৬ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, সিলেট-এর উদ্যোগে বাদ জুমুআ এক আনন্দঘন পরিবেশে পূর্বের কর্মসূচী মোতাবেক ঈদ পুনর্মিলনী ও তরবিয়তী সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠান প্রেসিডেন্ট ইকবাল হোসেন চৌধুরীর সভাপতিত্বে পরিচালিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জনাব মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন এবং জনাব জানে আলম। প্রথমে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব মাহমুদ আহমদ। তারপর পর্যায়ক্রমে জনাব আব্দুল বাতেন, জনাব বদরুল ইসলাম এবং জনাব ফরিদ উদ্দিন ঈদের আনন্দ ও অন্যান্য ঘটনাবলী তুলে ধরে বক্তৃতা প্রদান করেন। পরিশেষে মৌলবী মোহাম্মদ আমীর হোসেন ঈদের দিনের অভিব্যক্তি ও তরবিয়তী বিষয়ে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর কিছু ঘটনা তুলে ধরেন। সবশেষে সভাপতি সমাপনী বক্তৃতা ও দোয়ার মাধ্যমে সভা শেষ হয়।

মোহাম্মদ আমীর হোসেন

বন্যা দূর্গতদের সাহায্য

গত ২৫ জুলাই থেকে ২৭ জুলাই ২০১৬ পর্যন্ত পঞ্চগড় জেলার করতোয়া নদীর পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় শালসিড়ির বিভিন্ন স্থানে বন্যা দেখা দেয়। এতে শালসিড়ি জামাতের ডাঙ্গা হালকায় আহমদী ও গয়ের আহমদী ২৬ টি পরিবারে বন্যার পানি ঢুকে। এতে বাসায় খাওয়া দাওয়া এবং থাকার কোন পরিবেশ থাকে না। যার কারণে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া শালসিড়ীর পক্ষ থেকে খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। এতে স্থানীয় সরকারও সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

কায়েদ, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, শালসিড়ি

মজলিস আনসারুল্লাহ্ ঢাকার কুরআন তেলাওয়াত প্রতিযোগিতা

গত ২৪ জুন বাদ জুমুআ ঢাকার দারুত তবলীগ মসজিদে মজলিস আনসারুল্লাহ্ ঢাকার উদ্যোগে পবিত্র রমযান উপলক্ষ্যে বিশেষ কুরআন তেলাওয়াত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে আতফাল, খোদ্দাম এবং আনসার সদস্যগণ অংশগ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেয়া হয়।

মজলিস আনসারুল্লাহ্ ঢাকার খিলাফত দিবস অনুষ্ঠিত

গত ৩ জুন, বাদ জুমুআ মজলিস আনসারুল্লাহ্ ঢাকার উদ্যোগে নাখালপাড়া হালকায় স্থানীয় জামে মসজিদে জনাব মাজেদুর রহমান ভূইয়ার সভাপতিত্বে খিলাফত দিবস অনুষ্ঠিত হয়। এতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব ফারুক আহমদ। এরপর পর্যায়ক্রমে খিলাফত দিবসের গুরুত্ব ও কল্যাণ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব মোবাশ্বের আহমদ, নাসির আহমদ এবং মৌলবী নাসের আহমদ আনসারী। সভাপতির নসীহত মূলক বক্তব্য ও দোয়ার মাধ্যমে খিলাফত দিবসের সমাপ্তি ঘটে। এতে ৫৮জন উপস্থিত ছিলেন।

শফিকুল হাকিম আহমদ

মিরপুরের অসুস্থ ও বয়োজ্যেষ্ঠ আনসার সদস্যদের সাথে সাক্ষাৎ

গত ৭ জুলাই ২০১৬ বৃহস্পতিবার পবিত্র ঈদুল ফিতর এর দিন মজলিস আনসারুল্লাহ মিরপুর এর উদ্যোগে মিরপুর মজলিসের বিভিন্ন হালকায় অবস্থানরত অসুস্থ্য ও বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যদের বাড়িতে তোহফাসহ সাক্ষাৎ করা হয় এবং তাদের খোঁজ-খবর নেয়া হয়। সদস্যরা হলেন সর্বজনাব মোহাম্মদ পানাউল্লাহ, সৈয়দ মোশাররফ হোসেন, ওবায়দুর রহমান ভুঁইয়া, আতাউর রহমান, সুলতান আহমদ রারী, আব্দুর রহমান ভুঁইয়া, সাদেক দূর্গারামপুরী ও মীর মোহাম্মদ শফি। সকলের সুস্বাস্থ্য কামনায় তাদের জন্য দোয়া করা হয়।

মোহাম্মদ রুকুনুজ্জামান দুলাল

লাজনা ইমাইল্লাহ, তেজগাঁও-এ খিলাফত দিবস

গত ৩/৬/১৬ইং তারিখ রোজ শুক্রবার তেজগাঁও লাজনা ইমাইল্লাহর উদ্যোগে খিলাফত দিবস পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শারমিন আক্তার শিখা, প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ, তেজগাঁও। ফারহানা মাহমুদ তন্বীর কুরআন তেলাওয়াত এর মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এতে আলোচনা করেন সভাপতি। নযম পেশ করেন ভিকারুন্নেছা লুনা। শেষে সেলিনা এলাহীর দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। এতে ২০ জন উপস্থিত ছিলেন।

শারমিন আক্তার (শিখা)

শোক সংবাদ

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, পাগুলিয়া মৌলভী বাজার এর প্রবীন সদস্য আব্দুর রহিম গত ০৬/০৬/২০১৬ রোজ সোমবার সকাল ৮-৪৫ মিনিটের সময় নিজ বাসভবনে বার্ধক্যজনিত কারণে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মরহুম পাগুলিয়া জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব আব্দুল করীম লন্ডনীর ছোট ভাই। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। উল্লেখ্য যে, মরহুম ও তার ভাই ১৯৯৫ইং সালে পাগুলিয়াতে একই দিনে বয়আত গ্রহণ করে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। মৃত্যুকালে মরহুম স্ত্রী, ৩ ছেলে, ৪ মেয়ে, ৯ নাতী, ৫ নাতনী ও অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে যান। তিনি অত্র এলাকার একজন শান্তিপ্রিয় মানুষ ছিলেন।

মরহুমকে পাগুলিয়া জামাতের কবরস্থানে সমাহিত করা হয়। আল্লাহ্ যেন মরহুমকে জান্নাতের উঁচু আসনে সমাসীন করেন এবং তার পরিবারের সবাইকে সাবরে জামীল দান করেন সে জন্য দোয়ার আবেদন করছি।

আব্দুল করিম
প্রেসিডেন্ট, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, পাগুলিয়

** শুভ বিবাহ **

* মোহাম্মদ জিন্নাত আলীর কনিষ্ঠপুত্র মোহাম্মদ মোস্তাক মাহমুদ কিরণের সাথে দিনাজপুর ভাতগাঁও জামাতের জনাব মোহাম্মদ আব্দুর রশিদ-এর কনিষ্ঠা কন্যা আয়েশা সিদ্দিকার শুভ পরিনয় গত ০৮/০৭/২০১৬ইং ২,০০,০০০/- (দুইলক্ষ) ঢাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়েছে।

মোহাম্মদ জিন্নাত আলী
আহমদীয়া মুসলিম জামাত,
তাহেরাবাদ, রাজশাহী

* গত ০৩/০৪/২০১৬ তারিখ পাত্র জনাব রাকিবুল হাসান, পিতা-জনাব জি,এম, ফজলুল হক। পাত্রী রাবেয়া বশরী, পিতা-মৃত মোতালেব শেখ ৯৯,৯,৯৯/- (নিরানব্বই হাজার নয়শত নিরানব্বই) টাকা মোহরানায় বিবাহ সুসম্পন্ন হয়, আলহামদুলিল্লাহ্।

* গত ২৯/০৪/২০১৬ তারিখ পাত্র জনাব মেহেদী হাসান, পিতা-জনাব শহীদুল্লাহ্ সরদার। পাত্রী শেফালী পারভীন, পিতা-জনাব শহীদুল ইসলাম, ১,০০,০০১/- (একলক্ষ এক) টাকা মোহরানায় বিবাহ সুসম্পন্ন হয়, আলহামদুলিল্লাহ্।

* গত ২৯/০৪/২০১৬ তারিখ পাত্র জনাব গোলাম সারোয়ার, পিতা-জনাব মিজানুর রহমান মোড়ল। পাত্রী শাবানা খাতুন, পিতা-জনাব মহিদ শানা, ৭২,০০০/- (বাহাত্তর হাজার) টাকা মোহরানায় বিবাহ সুসম্পন্ন হয়, আলহামদুলিল্লাহ্।

বায়েজীদ হোসেন
সেক্রেটারী রিসতানাতা
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, সুন্দরবন

* গত ০৮/০৭/২০১৬ আমাদের একমাত্র ছেলে ডা: ইজাজুর রহমান (শুভ) পিতা-মুহাম্মদ শামসুর রহমান, মাতা-মিসেস দীনা নাসরীন, ১৫/১, নিরালা আবাসিক এলাকা, খুলনা-৯১০০-এর সাথে তাহেরা মাজেদ (রাফা), পিতা- শহীদ ডা: এম,এ, মাজেদ, মাতা-মিসেস কুরায়শা মাজেদ, 'শাহানা কটেজ' ২৭/২ জাহিদুর রহমান ক্রস রোড, বাগমারা খুলনার বিবাহ- ৬০০,০০০/- (ছয় লক্ষ) টাকা দেন মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। তাদের দাম্পত্য জীবন যাতে সুখ সমৃদ্ধ হয় এবং ধর্মকে পার্থিব সকল বিষয়ের ওপর প্রাধান্য দিয়ে চলতে পারে সেজন্য সকলের নিকট দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

শামসুর রহমান
ওয়াকেফে জিন্দেগী, খুলনা

সম্পূর্ণ বিনা খরচে প্রফেশনাল কোর্সে ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সকল সদস্য/সদস্যাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বকশি বাজারস্থ আই.টি একাডেমীর আন্ডারে প্রাণ-আর.এফ.এল গ্রুপের সহযোগিতায় সম্পূর্ণ বিনা খরচে বিভিন্ন প্রফেসনাল কোর্স চালু আছে। আগ্রহী সকল সদস্য/সদস্যাদের আইটি একাডেমীতে রেজিষ্ট্রেশন করতে অনুরোধ করা হল।

প্রফেসনাল কোর্সসমূহ :

Basic Computer (MS.Office, Hardware, Internet browsing), Web Design, Auto CAD, Photoshop, Nursing (100 nurse required), Automobiles, Networking, Film making, plumbing, Driving, Spoken English, Electrical mechanical, TV/Radio/Fridge mechanics, Garments, Fish cutting, Pultry farming, Radhuni/chef etc.

বি. দ্র.: কোর্স শেষে রয়েছে চাকরী পাওয়ার বিশাল সম্ভাবনা। দেরি না করে আজই যোগাযোগ করুন

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ:

তফছির আহমদ রনি
আই.টি ইনস্ট্রাকটর-আই.টি একাডেমী
কো-অরডিনেটর- আমজাদ ফাউন্ডেশন।
৪ নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১
মোবাইল: ০১৭৩৬ ১০০৪২৬,
০১৬৮৪০৭৮৩৮২।
ইমেইল:
ahmed.tafsir@yahoo.com.

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত সম্পর্কে জানতে লগইন করুন:-
www.alislam.org, www.ahmadiyyabangla.org,
www.mta.tv

চাকরি বিজ্ঞপ্তি

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সকল সদস্য/সদস্যাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বকশি বাজাস্থ আই.টি একাডেমীর আন্ডারে প্রাণ-আর.এফ. এল গ্রুপের সহযোগিতায় জামাতের পক্ষ থেকে বেকারত্ব দূরীকরণের একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ্।

চাকুরী করতে ইচ্ছুক সকল শিক্ষিত/ অর্ধশিক্ষিত/ অশিক্ষিত বেকার সদস্য/সদস্যাদের নিম্নলিখিত ঠিকানায় ঈ.ঠ জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হল।

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ:

তফছির আহমদ রনি
আই.টি ইনস্ট্রাকটর-আই.টি একাডেমী
কো-অরডিনেটর- আমজাদ ফাউন্ডেশন।
৪ নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১
মোবাইল: ০১৭৩৬ ১০০৪২৬,
০১৬৮৪০৭৮৩৮২।
ইমেইল:
ahmed.tafsir@yahoo.com.

শোক সংবাদ
দেশমাতৃকার সেবক আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ক্রোড়ার বীর মুক্তিযোদ্ধা অবসরপ্রাপ্ত সুবেদার আবু তাহের বীর প্রতীক-এর ইন্তেকাল রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন সম্পন্ন

অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, আহমদীয়া মুসলিম জামাত ক্রোড়া কোড়াবাড়ী হালকা বীর মুক্তিযোদ্ধা ছুবেদার আবু তাহের অবঃ বীর প্রতীক গত ২৭/০৭/২০১৬ইং তারিখে বুধবার রাত ৮-২০ মিনিটে বার্ধক্যজনিত কারণে প্রায় ৯০ বছর বয়সে নিজ বাড়িতে ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) মৃত্যুকালে তিনি ২ পুত্র ৪ কন্যা প্রায় এক কুড়ি নাতি নাতনী রেখে গেছেন। ১৯১৭ সনে যে বার জন পুণ্যাত্মার আহমদীয়াত গ্রহণের ফলে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ক্রোড়ার গোড়াপত্তন হয়েছিল সেই বারজনের একজন মরহুম মাষ্টার আফছার উদ্দিন সাহেবের দ্বিতীয় সন্তান ছিলেন মরহুম। তিনি ১৯২৯ সালে ৫ জুন কোড়াবাড়ী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্র জীবন থেকেই মরহুম জামাতের সাথে সংযুক্ত ছিলেন। তিনি খুব সৎ ও ধার্মীক ছিলেন। মরহুম ১৯৭১ সনে যে বার জন পুণ্যবান ব্যক্তি আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিলেন তাদের একজন মরহুম জয়নুদ্দিন মুন্সির একমাত্র পুত্র মরহুম সিরাজ উদ্দীনের কন্যা মোছাঃ ছালেহা বেগমকে বিবাহ করেন। স্বামী স্ত্রী উভয় খুব নেক পুন্যবান। কেউ আহমদী হিসাবে পরিচয় দিলে তাকে নিজের ভাই বোন ও সন্তানের মত মনে করতেন এই দম্পতি। সাধ্যমত মেহমান নেওয়াজী করতেন। মরহুম চাঁদা ও নামাযের প্রতি সতর্ক ছিলেন। মরহুম আহমদীয়া মুসলিম জামাত ক্রোড়ার প্রেসিডেন্ট ও জেনারেল সেক্রেটারীর দায়িত্বও পালন করেছেন।

২০০০ সালে ক্রোড়া জামাতের মোখালেফাতের সময় মোখালেফাতকারীরা মরহুমের বাড়ীঘর ভাঙ্গার ও লুটপাট করে এবং মরহুমকে মারদর করে। তীব্র আঘাতের ফলে মরহুমের একটি চোখের দৃষ্টি নষ্ট হয়ে যায়। দৃষ্টিহীন চোখ এবং শারীরিক আঘাতের ফলে তাঁর স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

হাইস্কুলে লেখাপড়া শেষে মরহুম কর্ম জীবনের প্রথমে পাকিস্তানী পুলিশ বাহিনীতে চাকুরী নেন। সততা ও যোগ্যতার জন্য তিনি খুব সুনাম অর্জন করেছিলেন তিনি। তারপর মরহুম ২/১১/১৯৪৯ সনে ই.পি আর-এ চাকুরী থাকাকালীন অবস্থায় ১৯৭১ সালে যখন ১০ম ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, প্রাক্তন ই.পি আর এর সকল শ্রেণীর সৈনিক আনসার মোজাহিদ এবং অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে ১০ম ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট-এ যোগ দেন এবং ২নং সেক্টরে সালদা নদী হতে বেলুনীয়া পর্যন্ত বিড়ে বীরত্বের সাথে বীর মুক্তিযুদ্ধ করেন। ১০ ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট মুক্তি যুদ্ধে তার বীরত্ব যোদ্ধ কৌশল সততা, ও অন্যান্য গুণাবলীর কারণে মরহুমকে বীর প্রতীক সম্মাননা খেতাবে ভূষিত করেন। এছাড়াও তিনি সেনা প্রধানের পক্ষ হতে (১) জাম্বুরিয়া, (২) জঙ্গ (৩) তগমা-ই-হীর্ব (৪) রন তারকা (৫) সমর পদক (৬) মুক্তি তারকা (৭) জয় পদক (৮) Constitution মেডেল (৯) সি.এ.এস স্মারক পত্র দ্বারা সম্মানীত হন। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে এতগুলো সম্মান পদক প্রাপ্ত সৈনিক আজও এদেশে বিরল। এই বীর মুক্তিযোদ্ধা ১৬ই আগষ্ট ১৯৭৮ইং তারিখ চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ এর পর তিনি দীর্ঘদিন জামাতের খেদমত করেন। অবশেষে বার্ধক্যে উপনীত হয়ে দীর্ঘ সময় রোগ শোক ভোগে অবশেষে ২০০০ সনের মোখালেফাতে তার চোখ এবং শরীরে আঘাতের পর তিনি আরও বেশী অসুস্থ হয়ে পড়েন। মরুহম বেশ কয়েক বছর বিছানায় শয্যাশায়িত ছিলেন। গত ২৮ জুলাই বাদ যোহর আহমদীয়া মুসলিম জামাত ক্রোড়া মসজিদে মাহমুদ মাঠ প্রাঙ্গনে মরহুমের জানাযার নামায অনুষ্ঠিত

হয়। জানাযার নামায পড়ান মওলানা শামসুদ্দিন মাসুম। জানাযার নামাযে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও আখাউড়া উপজেলার বিপুল সংখ্যক মুক্তিযোদ্ধাগণ অংগ্রহণ করেন। জানাযা শেষে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলার নির্বাহী অফিসার এর কার্যালয়ের প্রকৌশলী এ টি এম বদিউল আলম এবং মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সদর উপজেলার মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার আলহাজ্জ মোহাম্মদ আবু হোরাইরা মরহুমের মরদেহে পুষ্পার্ঘ অর্পন এর মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানান। শ্রদ্ধার পর এ, এস, আই বদিউল আলম এর নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনীর একটি চৌকষ ও সু-সজ্জিত দল সশস্ত্র সালাম প্রদান এর পর মরহুমের প্রতি শ্রদ্ধা স্বরূপ ১ মিনিট নিরবতা পালন করেন। মরহুমের মরদেহ তখন জাতীয় পতাকা দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল এবং বিউগলে তখন করুণ সুর বাজছিল।

রাষ্ট্রীয় মর্যাদা শেষে মরহুমকে কুমিল্লা সেনানিবাসের ২৮ মিডিয়াম রেজিমেন্ট আর্টিলারী এর সেকেন্ড লেঃ মোহাম্মদ রাশেদুল করিম এর নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর ২৭ সদস্যের একটি চৌকুষ ও সু-সুজ্জিত দল মরদেহকে শসস্ত্র সালাম প্রদানের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানান। মরহুমের মরদেহ তখন জাতীয় পতাকা ও সেনা পতাকা দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। বিউগলে তখন করুণ সুর বাজছিল।

সশস্ত্র সালাম শেষে সেনা সৈনিকরা মরহুমের লাশ কাঁধে করে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ক্রোড়া কবরস্থানে নিয়ে যান। দাফন শেষে মরহুমের সম্মানার্থে ১ মিনিট নিরবতা পালন শেষে উর্ধ আকাশে ১৬ রাউন্ড গুলি ছোড়া হয়। গুলিছোঁড়া শেষে সেকেন্ড লেঃ রাশেদুল করিম এর নেতৃত্বে মরনোত্তর সশস্ত্র সালাম প্রদানের মাধ্যমে মরহুমের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। তখন বিউগলে করুণ সুর বাজছিল সশস্ত্র সালাম প্রদান শেষে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধানের পক্ষ থেকে মরহুমের কবরে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে মরহুমের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। শ্রদ্ধা জানানোর সাথে সাথে সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে দোয়া পরিচালনা করেন। পরক্ষণে জামাতের পক্ষ থেকে দোয়া করেন জনাব মাহমুদ আহমদ সুমন। মহান আল্লাহ্ তা'লা যেন মরহুমের সকল নেক কাজ কবুল করে এবং জান্নাতের সুশীতল ছায়াতলে স্থান দান করেন এবং মরহুমের শোক সন্তপ্ত পরিবারের সকলের ধৈর্যধারন করার শক্তিদান করেন সেই জন্য সকলের নিকট খাসভাবে দোয়ার আবেদন করছি।

এনামুল হক (ইন্টু)

[পাক্ষিক আহমদীর পক্ষ থেকে বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।]

আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ

ভারতের কর্ণাটক প্রদেশের সাগর শহরে আহমদীয়া জামাতের উদ্যোগে আয়োজিত "শান্তি সম্মেলন" অনুষ্ঠিত

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ভারতের উদ্যোগে গত ২৯ মে, ২০১৬ কর্নাটক অঞ্চলে সাগর শহরে একটি "শান্তি সম্মেলন" আয়োজন করা হয়। এ বছরের শান্তি সম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "পারমাণবিক যুদ্ধের ভয়ানক পরিণাম এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব"। বিভিন্ন ধর্মীয় মতাদর্শের নেতৃবৃন্দ এ শান্তি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন এবং তাদের নিজ নিজ ধর্মীয় শিক্ষার আলোকে পারস্পরিক ভাতৃত্ববোধ এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোকপাত করেন।

এ সময় আহমদীয়া মুসলিম জামাতের একজন প্রতিনিধি জামাতের বর্তমান খলীফা হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)-এর উদ্ধৃতি অনুসারে ন্যায়বিচার ও শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইসলাম ধর্মের অতুলনীয় শিক্ষামালা তুলে ধরেন।

একটি সংক্ষিপ্ত ভিডিও ক্লিপ বা প্রামান্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়। এতে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বর্তমান হুযূরের বহুবিধ কর্মকান্ডের একটি সচিত্র প্রতিবেদন তুলে ধরা হয়। এছাড়া, এ সম্মেলনে 'কান্নাড' ভাষায় অনুদিত হুযূর (আই.) কর্তৃক লিখিত "বিশ্ব সংকট ও শান্তির পথ" শীর্ষক পুস্তকটি মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

বিপুল সংখ্যক অ-আহমদী অতিথি এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন এবং ইসলামের সঠিক শিক্ষা জানতে পেরে এই আয়োজনের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, অস্ট্রিয়ার ১১তম বার্ষিক জলসা সফলভাবে অনুষ্ঠিত

গত ১৫ মে, ২০১৬ তারিখে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, অস্ট্রিয়ার ১১তম বার্ষিক জলসা ভিয়েনা শহরে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

এদিন পতাকা উত্তোলনের পর সকাল ১০:৩০টায় পবিত্র কুরআন ও নযম পাঠের মাধ্যমে জলসার কার্যক্রম আরম্ভ হয়। এরপর অস্ট্রিয়া জামাতের ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট জনাব জাহাঙ্গীর মোর্শেদ আলম জলসা উপলক্ষ্যে প্রেরিত হুযূর (আই.)-এর বিশেষ বাণী পাঠ করে শোনান। হুযূর তাঁর বাণীতে অস্ট্রিয়ায় বসবাসরত আহমদীদেরকে বয়আতের মূল উদ্দেশ্য অনুধাবন করে যুগ খলীফার সাথে বিশ্বস্ততাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন।

প্রথম অধিবেশনে বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করেন পোল্যান্ডের মুরব্বী মওলানা মাশহুদ আহমদ জাফর সাহেব, তিনি "বিধর্মীদের প্রতি মহানবী (সা.)-এর সদ্ব্যবহার কীরূপ ছিল" সে সম্পর্কে হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য প্রদান করেন। অ-মুসলমান অস্ট্রিয়ান অতিথিরা তার এ বক্তৃতা শুনে গভীরভাবে আন্দোলিত হয়েছেন।

এছাড়া একটি বিশেষ বক্তব্য শোনার জন্য এই জলসায় অ-মুসলমান অস্ট্রিয়ান অতিথিদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল যার মূল বিষয়বস্তু ছিল, "ইসলাম কি ভয়-ভীতি না-কি শান্তি ও নিরাপত্তার বার্তাবাহক" একজন অস্ট্রিয়ান আহমদী জনাব মোহাম্মদ ইউনুস মাইয়ের হোফার এই বক্তব্য প্রদান করেন। এ বছর বেশি সংখ্যক অস্ট্রিয়ান অতিথিদের জলসায় যোগদানের জন্য উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল এবং আল্লাহ্‌র ফযলে ৬৭জন অতিথি এই অধিবেশনে যোগদান করেন। এদের মধ্যে কয়েকজন প্রায় ছয়শ' কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে জলসায় যোগদান করেন।

দ্বিতীয় অধিবেশনে জামেয়া আহমদীয়ার শিক্ষক মওলানা মুনীর মনোয়ার সাহেব সভাপতিত্ব করেন। এ সময় অস্ট্রিয়ার মুবাল্লিগ ইনচার্জ মওলানা সাদাকাত আহমদ সাহেব "আল্লাহ্‌র রাস্তায় আর্থিক কুরবানীর গুরুত্ব" শিরোনামে বক্তব্য প্রদান করেন এবং জামাতের সদস্যদের ধর্মসেবার জন্য আর্থিক কুরবানী করতে অনুপ্রাণিত করেন।

জলসায় মোট ২৮৪জন নারী পুরুষ যোগদান করেন যা গত বছরের তুলনায় ছিল প্রায় দ্বিগুণ। জার্মানী, হাঙ্গেরী এবং সুইজারল্যান্ড থেকেও জামাতের বন্ধুরা এই মহতি জলসায় যোগদান করেন বলে জানা গেছে।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, কানাডার উদ্যোগে খিলাফত দিবস উদযাপন

গত ২৭ মে ২০১৬, জামা'ত আহমদীয়া কানাডা জলসা খেলাফত দিবস উদযাপন করে। কানাডাব্যাপী হাজার হাজার আহমদী সদস্য এ দিবসটি উদযাপন করে।

ভেনকভারের বায়তুর রাহমান মসজিদে জলসা পরিচালনা করেন রিজিওনাল আমির নাইম লাখান সাহেব। তিনি অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন। তারপর বক্তব্য রাখেন সেক্রেটারী তারবিয়ত মালিক সাকিল সাহেব এবং লোকাল মিশনারি গোলাম খোকার সাহেব। জলসা সমাপ্ত হয় দোয়ার মাধ্যমে। অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত সকলের মাঝে নাস্তা পরিবেশন করা হয়।

এডমন্টনের বায়তুল হাদি মসজিদে খেলাফত দিবস উদযাপিত হয় অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে এ জলসায় নর নারী সহ উপস্থিতির সংখ্যা ছিল ৩০০ জনেরও বেশি। পবিত্র কুরআন পাঠের পর মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী পাঠ করা হয়। তারপর বক্তারা খেলাফতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনিয়তার ওপর বক্তব্য রাখেন। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

বৃহত্তর টরেন্টোতে তিনটি ভাগে জলসা উদযাপন করা হয়। তিনটি ভাগে অন্তর্ভুক্ত ছিল পীস ভিলেজ, ব্রাম্পটন এবং মিসিসাগা রিজিওন। তাদের মোট উপস্থিতির সংখ্যা ছিল ৩,৫০০জন। ব্রাম্পটনের জলসায় সভাপতিত্ব করেন কানাডার আমির, লাল খান মালিক সাহেব। কুরআন তেলাওয়াতের পর স্থানীয় আতফালরা খেলাফতের ইতিহাসের ওপর একটি ডকুমেন্টারি উপস্থাপন করেন। তারপর ব্রাম্পটনের মিশনারি যাহিদ সাবিত সাহেব এবং সেক্রেটারী ওসীয়ত কলিম মালিক সাহেব খেলাফতের ওপর বক্তব্য রাখেন।

টরেন্টোর বায়তুল ইসলাম মসজিদে উদযাপিত জলসার সভাপতিত্ব করেন কানাডার মিশনারি ইনচার্জ, মওলানা মুবারাক নাযির সাহেব। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন কানাডার ন্যাশনাল সেক্রেটারী তারবীয়ত শাহিদ মানসুর সাহেব। জলসায় সমাপ্তি ভাষণ প্রদান করেন মওলানা মুবারাক নাযির সাহেব। সবশেষে দোয়ার মাধ্যমে জলসা সমাপ্ত হয়।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, নিউজিল্যান্ড এর উদ্যোগে আয়োজিত Mosque open day অনুষ্ঠিত

সত্যিকার ইসলামের পরিচিতি তুলে ধরা এবং প্রচারের নিমিত্তে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) মসজিদ নির্মাণের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তার প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেছেন। নিউজিল্যান্ডে অবস্থিত আহমদীয়া মুসলিম জামাত, অকল্যান্ডের নবনির্মিত মসজিদটি এরই একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বহন করে।

বর্তমানে নিউজিল্যান্ডের সবচেয়ে বড় মসজিদ হিসেবে স্বীকৃত মসজিদের নাম বায়তুল মুকীত, যা ২০১৩ সালের পহেলা নভেম্বর নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বর্তমান খলীফা হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) উদ্বোধণ করেন। মসজিদ নির্মাণের পর হতে হাজার হাজার দর্শনার্থীরা এ মসজিদ পরিদর্শন করেছেন। এছাড়া বিভিন্ন সময় গণমাধ্যমে প্রচারের কল্যাণেও দেশে-বিদেশে আহমদীয়া জামাতের ব্যাপক পরিচিতি ছড়িয়ে পড়ে এ মসজিদের কল্যাণে। প্রায়ই স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এ মসজিদ পরিদর্শনে আসে এবং মসজিদ কর্তৃপক্ষ তাদের যথাযথ রীতি অনুসরণ করে আমন্ত্রণ জানিয়ে থাকেন।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত নিউজিল্যান্ড অ-আহমদী এবং অমুসলিমদের এ মসজিদের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতি বছর দু'দিন এতে সর্বসাধারণের প্রবেশের আয়োজন করে। আল্লাহ্ তা'লার অশেষ রহমতে এ বছর গত ২১ মে ২০১৬ একটি "ওপেন ডে"র আয়োজন করা হয়। এ আয়োজন সফল করার লক্ষ্যে প্রায় এক হাজারেরও অধিক আমন্ত্রণপত্র ঘরে ঘরে বিতরণ করা হয়। এছাড়া স্থানীয় জামাতের সদস্যরা তাদের বন্ধু-বান্ধব, সহকর্মী এবং প্রতিবেশীদের বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানান।

নিউজিল্যান্ড জামাতের স্বেচ্ছাসেবকরা এদিন প্রায় সহস্রাধিক অতিথিদের নিয়ে মসজিদের চারপাশ ঘুরে দেখায় এবং মসজিদ ও ইসলাম সম্পর্কে অতিথিদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। এছাড়া সেচ্ছাসেবকদের উদ্যোগে বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড ও ব্যানার প্রদর্শনেরও ব্যবস্থা করা হয়, যাতে সমসাময়িক বিষয়াদির আলোকে ইসলাম ধর্মের অনুপম শিক্ষামালা তুলে ধরা হয়।

একটি বুকস্টলেরও আয়োজন করা হয় যেখান থেকে আমন্ত্রিত অতিথিরা আগ্রহভরে পবিত্র কুরআন সহ জামাতের বিভিন্ন বই-পুস্তক সংগ্রহ করেন। অতিথিদের এক পর্যায়ে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়। আল্লাহ্ তা'লার অশেষ রহমতে উক্ত "ওপেন ডে" খুবই সফল হয় এবং অতিথিদের মনে ইসলাম সম্পর্কে যেসব ভুল ধারণা ছিল তার অবসান ঘটে।

মজলিস আনসারুল্লাহ্, জার্মানির বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

চল্লিশোর্ধ পুরুষরা যেন জীবনের সবক্ষেত্রে মেধাগত ও বাহ্যিক উন্নতি সাধনে নিযুক্ত থাকে সেজন্য হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) তাদের জন্য আনসারুল্লাহ্ নামে একটি অঙ্গ সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। গত ২০ থেকে ২২ মে ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্টে মজলিস আনসারুল্লাহ্, জার্মানির বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। এই ইজতেমার উদ্দেশ্য ছিল একক ও দলগত বিভিন্ন প্রতিযোগিতার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে জ্ঞানগত ও খেলাধূলার যোগ্যতা বৃদ্ধি করা।

পতাকা উত্তোলন ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। উদ্বোধনী অধিবেশনে পবিত্র কুরআন পাঠের পর মজলিস আনসারুল্লাহ্, জার্মানির সদর জনাব চৌধুরী ইফতেখার উপস্থিত আনসারদের উদ্দেশ্যে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন।

ফুটবল, ভলিবল, দড়ি টানাটানির মত খেলাগুলোর মাধ্যমে তারা তাদের দৈহিক শক্তি যাচাই করে নেওয়ার সুযোগ পান। খেলাধূলা ছাড়াও কুরআন তিলাওয়াত, আযান, বক্তৃতা প্রতিযোগিতার দ্বারা জ্ঞানগত যোগ্যতাও প্রদর্শন করেন।

এছাড়া ইজতেমার আধ্যাত্মিক পরিবেশ ও শিক্ষামূলক বক্তৃতার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী সদস্যরা নিয়মিত নামায ও ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধির প্রতি মনোযোগী হওয়ার প্রয়াস পান।

বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে হুযূর (আই.)-এর বিশেষ দোয়ার তাহরীক

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) গত ২ অক্টোবর, ২০১৫ ইং, রোজ শুক্রবার লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে জুমুআর খুতবায় নিম্নোক্ত তিনটি দোয়া বেশি বেশি পড়ার প্রতি জামা'তের সকল সদস্যকে নসীহত প্রদান করেন।

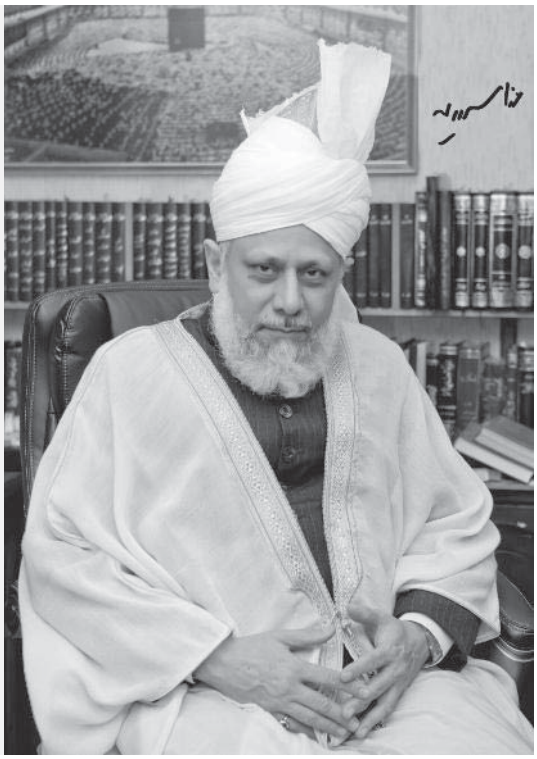

رَبِّ كُلُّ شَيْءٍ خَادِمُكَ
رَبِّ فَاحْفَظْنِيْ وَانْصُرْنِيْ وَارْحَمْنِيْ

"রাব্বি কুল্লু শায়ইন খাদিমুকা রাব্বি ফা'হফায্‌নী ওয়ানসুরনী ওয়ারহামনী।"

অর্থ : হে আল্লাহ্! সবকিছুই তোমার সেবায় নিয়োজিত। অতএব, হে আমার প্রভু! তুমি আমার নিরাপত্তা বিধান কর আর আমাকে সাহায্য কর এবং আমার প্রতি দয়া কর।

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ
وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ

"আল্লাহুম্মা ইন্না নাজ্‌আলুকা ফী নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম।"

অর্থ : হে আমার আল্লাহ্! আমরা তোমাকে তাদের বক্ষদেশে স্থাপন করছি এবং তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِي الْاٰخِرَةِ
حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۲۰۲﴾

"রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাওঁ ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়াকিনা আযাবান্নার।"

অর্থ : হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদেরকে এ দুনিয়াতে এবং পরকালে যাবতীয় মঙ্গল দান কর এবং আগুনের আযাব থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর।

*** এছাড়া হুযূর (আই.) ইস্তেগফার করার প্রতিও গুরুত্বারোপ করেন।**

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ
ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ

"আসতাগফিরুল্লাহা রাব্বী মিন কুল্লি যামবিওঁ ওয়া আতূবু ইলাইহি।"

অর্থ : আমি আমার প্রভুর নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আর তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন করছি।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

"আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাব।"

ইলহাম-হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে বাংলায় যুগ-খলীফা (আই.) প্রদত্ত জুমুআর খুতবা ও সময়োপযোগী নির্দেশনাসহ অমুল্য পুস্তকাদি, প্রবন্ধ, পাক্ষিক আহমদী ও অন্যান্য প্রকাশনা পড়তে, শুনতে ও দেখতে **log in** করুন:

www.ahmadiyyabangla.org

www.alislam.org

www.mta.tv

আসুন, আমরা নিজে দেখি-পড়ি-শুনি এবং অন্যদেরকে উৎসাহিত করি।

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

হাড়-জোড়া, বাত-ব্যথা, স্পাইন এবং আঘাত জনিত রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

ডাঃ মোঃ গোলাম রহমান (দুলাল)
এমবিবিএস, ডি-অর্থো (পঙ্গু হাসপাতাল)
এমএস (অর্থো)
সহযোগী অধ্যাপক, অর্থোপেডিক বিভাগ
সাহাবউদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
মোবাইল: ০১৭১২-০৯০৮২৬

চেম্বার :
ইবনে সিনা ডায়াগনোস্টিক এন্ড কনসালটেশন সেন্টার, বাড্ডা
বাড়ি নং- চ-৭২/১, প্রগতি স্বরণী, উত্তর বাড্ডা
ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।

সিরিয়ালের জন্য:
ফোন : +৮৮০ ২ ৮৮৩৫৫৫৬-৭
মোবাইল : ০১৮৩২-৮২০৯৫০

সময় : বিকেল ৫.০০টা থেকে ৮.৩০টা (শুক্রবার বন্ধ)
(বাড্ডা হোসেইন মার্কেটের বিপরীতে)

AMECON
NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz
Founder

Mobile: 01713001536, 01973001536
H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office
Palbari More, New Khairtola
Jessore. Tel : 67284

Bogra Office
Kanas Gari, Sherpur Road
Bogra. Tel : 73315

Chittagong Office
205, Baizid Bostami Road
Ctg. Tel : 682216

ameconniaz@yahoo.com

New Vol. No. 79 | 3rd Issue

The Ahmadi Fortnightly
Since 1922

15th August, 2016 Tk. 20.00
Regd. No. D. A.-12

জলই জীবন/ WATER THERAPY

জল চিকিৎসায় নিম্নবর্ণিত রোগসমূহ নিরাময় হয় :

(১) কোষ্ঠ কাঠিন্য (Constipation)- ১০ দিন পর এই চিকিৎসায় সর্বপ্রথম ফল পাবেন, (২) পাকাশয়জনিত রোগসমূহ (Gastric Problems)- ১০ দিন, (৩) উচ্চ রক্তচাপ (Hipertension)-১ মাস, (৪) বহুমুত্র (Diabetes)-১ মাস, (৫) ক্ষয়রোগ (Tuberculosis)-৩ মাস, (৬) চক্ষুকর্ণ নাসিকা রোগ (ENT Diseases)-৩ মাস, (৭) মুত্রথলী গ্রন্থি বৃদ্ধি রোগ (Enlargement of Prostate Gland)-৩ মাস, (৮) কর্কট রোগ (Cancer)-প্রথম থেকে রোগ ধরা পরলে ৬ মাস, (৯) পুরনো কঠিন চর্মরোগ-১ বছর।

জল চিকিৎসার নিয়ম :

(১) ঘুম থেকে উঠে মুখ না ধুয়ে কুলকুচি না করে (without mouth washing) শান্তভাবে ধীরে ধীরে ১.২৬০ লিটার অর্থাৎ বড় গ্লাসের ৪ গ্লাস জল পান করতে হবে। তাড়াহুড়া করা যাবে না। জলপান করার পর ৪৫ মিনিট কোন তরল বা শক্ত খাদ্য (Liquid or solid food) খাওয়া যাবে না। ধূমপান করা যাবে না।

(২) প্রাতঃরাশ, দুপুর ও রাতের আহার (Breakfast, Lunch and Dinner) করার সময় জল পান করা যাবে না। অসুবিধা হলে গলা ভেজাবার জন্য ২/৩ চামচ পরিমাণ জল খেতে পারেন। এই পরিমাণ বাড়ানো যাবে না। দুই ঘন্টা পর ইচ্ছেমত জল পান করা যাবে, দুর্বল বা অসুস্থ হলে চার গ্লাসের পরিবর্তে ১ অথবা ২ গ্লাস দিয়ে শুরু করতে পারেন। তবে অবশ্যই চার গ্লাস পান করতে হবে। যে কোন রোগেই জল চিকিৎসায় নিরাময় হতে পারে। বাতজনিত রোগে প্রথম ৭ দিন সকালে ও বিকালে ২ বার এই চিকিৎসা করতে হবে। উপশমের পর শুধু সকালে করলে চলবে।

(৩) দুপুর ও রাত্রে আহার করে শোয়ার পূর্বে অন্ততঃ আধাঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে। ঘুমানোর পূর্বে কোন কিছু আহার করা যাবে না। অসুবিধা মনে হলে ঘুমানোর আগে ২/৩ চামচ জল পান করা যাবে।

ধানসিড়ি রেষ্টুরেন্ট
দোতলা
রোড নং-৪৫, প্লট-৩৩, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫
মোবাইল: ০১৭০০৮৩৩২৫২, ০১৯৩০২১৪২৮৪

ধানসিড়ি রেস্তোরা
অর্কিড প্লাজা (তৃতীয় তলা)
(রাপা প্লাজার দক্ষিণ পার্শ্বে)
ধানমন্ডি, ঢাকা।
ফোন : ৯১৩৬৭২২, ০১৮১৯০৯৯০৩৫

"দিল মেঁ য়্যাহী হ্যা হারদাম তেরা সাহীফা চুমুঁ
কুরআঁ কে গিরদ্ ঘুমুঁ কা'বা মেরা য়্যাহী হ্যা"

আমার আন্তরিক বাসনা হলো, সর্বদা যেন তোমার কিতাব চুম্বন করি আর কুরআনের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করি; বস্তুত আমার কা'বা এটাই।
–হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

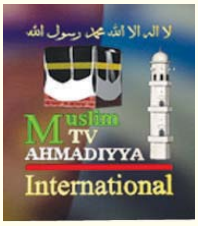

INTERNATIONAL

এমটিএ দেখুন
অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
০১৭১৬-২৫৩২১৬

এমটিএ-তে সরাসরি হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন

এমটিএ-তে খুতবা প্রচারের সময় সূচি

(১) শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬.০০ সরাসরি সম্প্রচার। পুনঃপ্রচার রাত ১০.২০ মিনিট এবং রাত ৪.০০।

(২) শনিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সকাল ৮.১০ এবং বিকাল ৫.০০।

(৩) রবিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০।

(৪) বৃহস্পতিবার একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় রাত ৮.০০।

Printed and Published by **Mahbub Hossain** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
Phone: 57300808, 57300849, Fax: 0088-2-57300880, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com